একক ৯ ❑ উনিশ শতকের ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রথম প্রকাশ

গঠন

৯.০ প্রস্তাবনা
৯.১ উনিশ শতকের ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রথম প্রকাশ
৯.২ প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারত ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার
৯.৩ মিলের ইতিহাস এবং প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র
৯.৪ অনুশীলনী
৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ প্রস্তাবনা

বর্তমান পাঠত্র(মে ভারতে ইতিহাস চর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে গত দুশো বছরের মুখ্য ধারাগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। আলোচনার শু(তে আঠার শতকের শেষভাগে ওরিয়েন্টালিস্ট নামে পরিচিত ভারতবিদ্যা-বিশারদদের অবদান স্মরণ করি। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এখানকার অধিবাসীদের অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ইতিহাস প্রসঙ্গে বিদেশী শাসকরা তথ্যসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করেছিল। ওরিয়েন্টালিস্টরা সেই চাহিদা পূরণ করেন। তাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞানপিপাসা দ্বারা চালিত হননি। এই কারণে তাঁরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। অন্যদিকে প্রশাসনের ভিতর সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা এদেশে নির্বিচারে প্রয়োগ করতে চান। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তারা কোনরূপ মর্যাদা প্রদর্শন করেননি। ভারতীয়দের তারা মনে করতেন অসংস্কৃত। ভারতীয়দের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। জেমস্ মিল ছিলেন এই ধারার প্রতিনিধি। তাঁর মনোভাব আমরা প্রথম অধ্যায় বি(-ষণ করেছি। আধুনিক কালে ভারতীয়দের ইতিহাস চিন্তার প্রাথমিক প্রকাশ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঘটতে দেখা যায়।

৯.১ উনিশ শতকের ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রথম প্রকাশ

একাদশ শতকের সূচনায় সুলতান মামুদের ভারতাভিযানের সঙ্গী প্রখ্যাত চিন্তাবিদ **অল-বি(ণী** তাঁর **তারিখ-ই-হিন্দ** গ্রন্থে ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনার অভাব উল্লেখ করেছেন। নির্দিষ্ট তথ্যের পরিবর্তে তারা কল্প কাহিনির অবতারণা করে বলে তাঁর অভিযোগ। গ্রীস দেশে প্রাচীনকালে **হেরোডটাস** কিম্বা **থুকিডাইডিস** অথবা রোম সাম্রাজ্যে **ট্যাসিটাস** কিম্বা **লিভি** ইতিহাস রচনার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। ব্যতিত্র(ম হিসাবে দ্বাদশ শতকে **কল্হন-** বিরচিত **রাজতরঙ্গিনী** গ্রন্থের নাম করা যায়। তবে সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচনার অভাব স্বীকার করতে হয়। এর কারণ এই নয় যে ইতিহাস বিষয়ের গু(ত্ব উপলব্ধিতে ধরা পড়েনি। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস পঞ্চম বেদের মর্যাদা লাভ করেছিল। সংস্কৃতে **ইতিহাস** শব্দের অর্থ ''এইরূপ ঘটেছিল'' **(ইতি-হ-আস)**। কৌটিল্যের ***অর্থশাস্ত্র*** গ্রন্থে ব্যাপকার্থে এই শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

পুরাণ, ইতিবৃত্ত, উদাহরণ, আখ্যায়িকা, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র তাঁর মতে ইতিহাস বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত(। পিতার শ্রাদ্ধকর্মে ইতিহাস আবৃত্তির নির্দেশ দিয়েছেন মনু। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে বিস্তৃত বংশতালিকা পাওয়া যায়, **পার্জিটার** যার সাহায্যে ভারতের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। তবে তা অত্যন্ত বিতর্কিত। রাজসভায় কবিরা আশ্রয়দাতার প্রশস্তি গেয়েছেন। এইসব রচনায় কল্পনা ও বাস্তবে প্রভেদ করা দুরূহ। মধ্যযুগে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পশ্চিম এশিয়ায়, পারস্য ও আরব দেশে ইতিহাস রচনার সমাদর ছিল। ভারতীয় লেখকরা শাসকদের রাজত্বকালের বৃত্তান্ত আরবী-ফারসী ভাষায় লেখার সময় এইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্যের আদি পর্বে ইতিহাস রচনার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে সময়ের দিক দিয়ে প্রথম **রামরাম বসু-র *মহারাজা প্রতাপাদিত্য রায়স্য চরিতম্*** (১৮০১)। গ্রন্থের সূচনায় লেখক বলেছেন, এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা তিনি পিতা এবং পিতামহের কাছ থেকে শুনেছেন। (''যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।'') এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলী সর্বজনজ্ঞাত। পরবর্তীকালে **নিখিলনাথ রায়** এই একই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে রামরাম বসুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন- ''যিনি সর্বপ্রথম অন্ধকারময় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গুহায় (ীণবর্তিকা হস্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এ(ণে তাহা বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হইলেও সেই (ীণবর্তিকা যে পরম আদরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গ ভাষার ঐতিহাসিকগণ বসুমহাশয়কে তাহারদিগের পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করিবেন।'' পাশ্চাত্য ইতিহাস রচনাশৈলী অনুসরণে রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ ***মহারাজা প্রতাপাদিত্য রায়স্য চরিতম্*** বলে নিখিলনাথ দাবি করলেও মধ্যযুগের ভারতে শাসনবৃত্তান্ত লেখার ঐতিহ্য স্মরণ করে **ডেভিড কফ্** বলেন- কেবলমাত্র একটি রচনার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়েছে বলা সঙ্গত নয়। (''Because Ramram's book was essentially a narrative of the rise and tribulations of a Hindu Raja of Jessore and because such traditions of secular rulers were part of the historical tradition in Muslim India, it is difficult on the basis of this work alone to prove the influence of a European historical outlook.'') -Kopf, 123-4.

আঠার শতকে বাংলার রাজনীতির কিছুটা পরিচয় মেলে দুটি গ্রন্থে। **রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের *মহারাজা কৃষ(চন্দ্র রায়স্য চরিতম্*** গ্রন্থটি ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর কিছু পূর্বে নদিয়া-রাজ কৃষ(চন্দ্র রায় দেহর(া করেছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় সংত্র(ান্ত প্রচলিত কাহিনির উল্লেখ করেছেন রাজীবলোচন। তাঁর ভাষা মাঝে মাঝে সংস্কৃত ঘেঁষা এবং সম্পূর্ণ ফারসী প্রভাবমুক্ত(। নাটকীয় রস সৃষ্টি করতে তিনি তাঁর লেখার কয়েক জায়গায় সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে রামরাম বসুর ***মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য চরিতম্*** গ্রন্থের তুলনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত ***রাজাবলী*** অধিক প্রতিনিধিস্থানীয় বলে **ডেভিড কফ্** মন্তব্য করেছেন। কু(ে(ত্র যুদ্ধের সময় থেকে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সামরিক সাফল্যলাভের ঘটনা এখানে স্থান পেয়েছে। আঠার শতকের এক পণ্ডিত হিন্দুদের পুরাবৃত্ত বিষয়ে নিজের বি(িপ্ত চিন্তাকে এখানে ছাপার অ(রে ধরতে চেয়েছেন— বলেছেন **কফ্** (''Mrityunjoy's *Rajabali* was the work of an eighteenth century pundit who has attempted to crystallize his random thinking on the Hindu past into the concrete form of the printed word.'')

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা ছিলেন ইংরেজদের আশ্রিত। উপরোক্ত(দুটি গ্রন্থের লেখক ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন বলে **ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার** মনে করেন। রাজীবলোচনের গ্রন্থ প্রকাশের সাত বছর আগে মহারাজ রাজবল্লভের পরিবারের প(থেকে গভর্নর জেনারেলের কাছে এক আবেদনপত্রে জানানো হয়েছিল, ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে মীর কাসিমের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। অনুরূপভাবে,

সিরাজউদ্দৌল্লার বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে মহারাজ কৃষ(চন্দ্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে নদিয়া-রাজের প(থেকে প্রচার করা হয়। রাজানুগ্রহলাভের আশা এর পিছনে প্রধান কারণ, বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাজীবলোচন এই ধারা অনুসরণ করে মহারাজা কৃষ(চন্দ্র এবং রাজবল্লভ সিরাজের বি(দ্ধে চত্র(ান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। **রাজাবলী** গ্রন্থে এর কোন উল্লেখ না থাকলেও সিরাজের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনায় রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষা প্রায় একইরকম। **রাজাবলী** গ্রন্থে কলকাতায় মহারাজ রাজবল্লভের আশ্রয় গ্রহণের কারণ হিসাবে নবাবের প(থেকে তাকে জাতিচ্যুত করার চেষ্টার উল্লেখ করা হয়েছে। ল(ণীয় যে রাজীবলোচনের গ্রন্থ প্রকাশের পাঁচ বছর পর **চার্লস স্টুয়ার্ট** তাঁর বাংলার ইতিহাস ***(হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল)*** গ্রন্থে সিরাজের বি(দ্ধে চত্র(ান্তকারীদের তালিকায় মহারাজ রাজবল্লভের উল্লেখ করেননি। সমকালীন অন্য কোনও সূত্রে **ডঃ মজুমদার** অনেক সন্ধান করেও এই চত্র(ান্তের সঙ্গে মহারাজ কৃষ(চন্দ্রের কোনও সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারেননি। অথচ জনশ্রুতির এমনই প্রভাব যে মহারাজ কৃষ(চন্দ্রের নাম এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত(হয়ে রয়েছে। রাজীবলোচনের দৃষ্টান্তেই **অধ্যাপক মজুমদার** মনে করেন সম্ভবত **দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়** ***ি(তীশ বংশাবলি*** গ্রন্থে মহারাজ রাজবল্লভকে সিরাজের বি(দ্ধে চত্র(ান্তকারীদের একজন ভেবেছেন। ইতিহাস রচনায় জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করা যায় না, সিরাজ প্রসঙ্গে রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আলোচনা এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ বলে ডঃ মজুমদার মনে করেন। (''The two Bengali works demonstrate what little reliance can be placed on popular tales about Sirajuuddaula and his times even though they were current less than half a century after his death.'' R. C. Majumdar,Maharaja Rajballabh, 44)। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় সম্প্রতি তাঁর ***পলাশীর ষড়যন্ত্র ও বাঙালি সমাজ*** গ্রন্থে নবাবের বি(দ্ধে বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণু(পুর এবং নদীয়ার রাজাদের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন। জগৎ শেঠের বাসভবনে সিরাজের বি(দ্ধে যে চত্র(ান্ত চলেছিল বলে রাজীবলোচন বর্ণনা করেছেন, অধ্যাপক রায়ের সে বিষয়ে মন্তব্য- ''এর উপর নির্ভর করা যায় না তবু এই বর্ণনাই সবচেয়ে বিস্তৃত।''

রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে আমরা এক নতুন যুগের সুচনা ল(্য করি। এবং সমাজ সংস্কার তাঁর বিভিন্ন রচনায় অতীত থেকে উদাহরণের অন্ত নেই। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ছাড়াও তিনি আরবী-ফারসী এবং গ্রীক ও লাতিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ***মনিয়ের উইলিয়ামস*** তাঁকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জনক বলেছেন, (''father of comparative theology'') হিন্দু শাস্ত্র, কোরাণ এবং বাইবেল তিনি মূলে পাঠ করেছিলেন। র(ণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে এসব বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মে ব্যুৎপত্তির কারণে তাঁকে বলা হত ''জবরদস্ত মৌলবী''। প্রাচীনকে তিনি আঁকড়ে থাকতে চাননি। শি(ার জন্যে সরকারের বরাদ্দ অর্থ পাশ্চাত্য শি(া প্রসারে এদেশে যাতে ব্যয় হয় সেজন্য তিনি ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। অথচ ভারতীয় ঐতিহ্যের অমর্যাদা তিনি কখনও সহ্য করেননি। ডঃ টাইটলার নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসকের সঙ্গে বিতর্ক এক জায়গায় চলাকালে তিনি বলেন- সভ্যতার উদয় হয়েছিল ভারতে। ইংরেজদের কাছ থেকে প্রযুক্তি(শি(ার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলেও সাহিত্য, বিজ্ঞান কিংবা ধর্ম বিষয়ে ভারতবাসীকে এসব বিষয়ে অন্য দেশের কাছে ঋণী হতে হয় না। আমাদের নিজেদের ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

''If by the 'Ray of Intelligence' for which the Christian says, we are indebted to the English he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent, and also my gratitude; but with respect to *Science, Literature* or *Religion* I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history

it may be proved that the world was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguish us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners.''

রামমোহন অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন, ধর্মের মূলসূত্র এক। পুরোহিতরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি সংকীর্ণতা ও পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হয়ে এক ঈশ্বরের চিন্তা করলে হিন্দু সমাজের মঙ্গল— একথা তিনি তাঁর ***বেদান্ত গ্রন্থ***-এর (১৮১৫) মুখবন্ধে বলেছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা। খিষ্টের নীতি নির্দেশকে বাইবেলের সার কথা মনে করতেন রামমোহন। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন একজন বিশ্বমানব। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের শত্রুরা শেষ পর্যন্ত কখনও সফল হতে পারে না বলে তিনি মনে করতেন। স্পেন, পর্তুগাল, দ(িণ আমেরিকা এবং আয়ারল্যান্ডের মুক্তি(সংগ্রামের প্রতি তিনি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে নেপলসে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি যেরকম দুঃখ পেয়েছিলেন, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ-বের সাফল্য তাঁকে সেরকম উৎসাহিত করে। লীগ অফ নেশনস প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই তিনি একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙেঘর স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফ্রান্সের সোসিয়েতে আসিয়াতিক্ তাঁকে সভ্য পদে বরণ করে। প্রাচ্যবিশারদদের অন্যতম **টমাস হেনরি কোলব্রুক**-এর সঙ্গে তাঁর গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। ভারত-আত্মার মর্মমূলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, এই কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ''ভারতপথিক'' আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদের সঙ্গে রামমোহনের অবশ্য একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস তা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ-

''রামমোহন পণ্ডিত হলেও এবং তাঁর নানা শাস্ত্রবিষয়ক রচনাবলী অনেক (ে ত্রে পরো(ভাবে প্রাসঙ্গিক গবেষণাকে সাহায্য করলেও, সেগুলি চরিত্রত গবেষণাকর্ম নয়। ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণের সঙ্গে তাঁর জিজ্ঞাসার (ে ত্র বহু সময়েই এক(কিন্তু সে জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন। পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে তাকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে বর্তমানের অধঃপতিত জাতি ও সমাজকে আত্মসচেতন ও রূপান্তরিত করাই তাঁর প্রাচ্যশাস্ত্রচর্চার উদ্দেশ্য। এক কথায় তাঁর পাণ্ডিত্য মাত্র বুদ্ধিবিলাস নয়, তার আধার হল সম্পূর্ণ মানবজীবন। এই কারণে তাঁর এই গোত্রভুক্ত(রচনাগুলিতে পাণ্ডিত্য ও মননের গভীরতার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত যে হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করা যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচনায় সাধারণত তা নেই।'' (**দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমী(া, ২২৭**)

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে **হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও** (১৮০৯-১৮৩১) ছিলেন তা(ণ্য ও মুক্ত(বুদ্ধির প্রতীক। ১৮২৮ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ছাত্রদের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে স(ম হন। ডিরোজিওর শিষ্যরা ডিরোজিয়ান বা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী নামে পরিচিত হন। ডিরোজিও-শিষ্য **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩) বলেছেন—ডিরোজিও প্রায়ই ছাত্রদের কাছে অতীত ইতিহাস থেকে দেশপ্রেম, ন্যায়পরায়ণতা, সমাজ-হিতৈষণা এবং আত্মত্যাগের কাহিনি পাঠ করে শোনাতেন। তাঁর ব্যাখ্যা গুণে ছাত্ররা উদ্বুদ্ধ হত। (''He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation and the way in which he set forth the points stirred up the minds of his pupils.'' Peary Chand Mitra, A biographical Sketch of David Hare) ১৮৩৩ সালে ডিরোজিয়ানরা **সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা** (Society for the Acquisition of General Knowledge, সং(েপে SAGK) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার

কৃষ(মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৩৫) উদ্বোধন করতে গিয়ে ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি ও গু(ত্ব (''The Nature and Importance of Historical Studies'') বিষয়ে বক্তৃ(তা করেন। তিনি বলেন— 'ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা বি(্বাস অর্জন করি। অতীতে অধঃপতিত বহু জাতি বর্তমানে যা কিছু মহৎ ও শুভ তার জন্যে প্রসিদ্ধ। ইতিহাস মন দিয়ে পড়লে আমরাও কি দেশ এবং নিজেদের উন্নত করার সম্ভাব্য বহু পথ খুঁজে পাবো না?'' (There are many nations that at one time groaned under wretched degradation, but who stand conspicuous now for everything that is good and great. Shall we not then in all probability come to the possession of many means of raising ourselves and our country if we attend closely to the lessons of history?'')

ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যে ইতিহাস চর্চায় **প্যারীচাঁদ মিত্র**-র নাম সর্বাগ্রে করত হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শু(করে পরবর্তী দু'বছর হিন্দু যুগে এদেশের অবস্থা সম্পর্কে তিনি চারটি অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (State of Hindustan under the Hindus.)। ভারতবিদ্যা চর্চায় **হোরেস হেম্যান উইলসন**-এর অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা ছাড়াও অন্যান্য যেসব গ্রন্থের তিনি সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হল **জেমস মিল**-এর ভারতের ইতিহাস (History of India), **জি. আর গ্লে-গ্** প্রণীত বৃটিশ ভারতের ইতিহাস *(History of British India),* এবং **টড্**-এর Annals and Antiquities of Rajasthan। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, টডের ইতিহাস ভারতীয়দের দীর্ঘকাল আকৃষ্ট করেছে। মোঘল সাম্রাজ্যের বি(দ্ধে রাজপুতদের সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা ইংরেজ উপনিবেশবাদের বি(দ্ধে নিজেদের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন। **কৃষ(মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়** সম্পাদিত ***বিদ্যাকল্পদ্রুম*** (Encyclopedia Bengalensis, ১৯৪৬-৫১) নামক কোষ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **প্লে-টো, রাজা বিক্র(মাদিত্য** এবং **যুধিষ্ঠিরের** চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ডেভিড হেয়ারের একটি জীবনী তিনি রচনা করেন।

সংস্কারকদের প্রভাবে ১৮৬০-এর দশক থেকে সমাজে নারীর ভূমিকা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে। প্যারীচাঁদ মিত্র এই আলোচনায় যোগ দেন। ১৮৬০ সালে তিনি ***রমারঞ্জিকা*** নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, যে হাত দোলনা দোলায়, তা পৃথিবী শাসন করে *("The hand that rocks the cradle, rules the world.")*। এই সূত্র ধরেই উল্লিখিত গ্রন্থে প্যারীচাঁদ দেখিয়েছেন সন্তান পালনে পরিবারে মা কিরকম গু(দায়িত্ব পালন করেন। উদাহরণ হিসাবে রামায়ণ মহাভারতের কতকগুলি প্রধান নারী চরিত্র (কৌশল্যা, সীতা, কুন্তী, এবং দ্রৌপদী), স্পার্টার বীর রমণী এবং রোম সাম্রাজ্যে প্রজাদের হিতাকাঙ্খী গ্রাচি-ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী কর্নেলিয়া-র নাম করেন। ***এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা*** নামে একই বিষয়ে অপর একটি গ্রন্থ প্যারীচাঁদ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি রাজপুতানার ইতিহাসে সংযুক্ত(া (পৃথ্বীরাজের সঙ্গ অমর প্রেমের কাহিনির নায়িকা হিসাবে) এবং আঠার শতকে মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাঈ (যাঁর পরিচালনা গুণে হোলকার রাজ্য বিশেষ উন্নতি করেছিল) চরিত্রের বর্ণনা করেন। *The Development of the Female Mind* নামক প্রবন্ধে বৌদ্ধ যুগে স্ত্রীশি(ার আলোচনা করেছেন প্যারীচাঁদ।

ডিরোজিওর আর এক শিষ্য **নীলমণি বসাক** (১৮০৮-১৮৬৪) **নব-নারী** গ্রন্থ রচনার জন্যে প্রসিদ্ধ। এদেশে পাশ্চাত্য শি(া প্রবর্তনে প্রথম যাঁরা উৎসাহ গ্রহণ করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন **ডেভিড হেয়ার** (১৭৭৫-১৮৪১)। ডিরোজিয়ানদের উদ্যোগে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। পূর্বোক্ত(রচনাটি নীলমণি বসাক এই প্রতিযোগিতায় লেখেন সেবছর প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ''প্রাচীন ও মধ্যযুগের নারী চরিত্র'' (''exemplary biography of females in ancient and medieval times'')। প্রতিযোগিতায়

প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। গ্রন্থ ভূমিকায় লেখক বলেছেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজে নারীদের অবহেলা করা হত, এই ধারণা দূর করতে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। নয়জন নারীর চরিত্র এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থের নাম ***নব-নারী***। এঁরা হলেন যথাত্র(মে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ এবং রানি ভবানী। অনুসন্ধান এবং তথ্য সংকলনের ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচিত বলে গ্রন্থকার দাবি করেছেন। পৌরাণিক কাল-চেতনাকে বর্জন করে লেখক পাশ্চাত্য কাল গণনার রীতি অনুসরণ করেছেন। পৌরাণিক ধারণায় কাল মণ্ডলাকৃতি। বিপরীতে পাশ্চাত্য চিন্তায় সময় সুনির্দিষ্ট রেখাপথে অগ্রসর হয়।

যে যুক্তি(বাদী আলোচনায় কালচত্রে(র পরিবর্তে সময়ের রৈখিক গতিপথ এবং পুণ্য চিন্তা অপে(া জাগতিকত বিবেচনা এমনকি প্রচলিত কাহিনি বর্ণনাতেও প্রাধান্য পায়, নীলমণি বসাকের গ্রন্থে তাঁর সার্থক দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চাকে পরিণতি দান করেছে। পৌরাণিক কালচিন্তার বেষ্টন থেকে ভারতের ইতিহাসকে উদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা পঞ্চাশ বছর আগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে শু(এখানে তা নিশ্চিত ভাবে জয়লাভ করল— বলেছেন **অধ্যাপক রণজিৎ গুহ।**

(''Thus, a rationalist discourse which enables linearity to replace cyclicity and the secular the sacred even in traditional narratives, celebrates in Nilmani Basak's *Nabanari* the coming of the age of a modern historiography in the Bengali language. It was a decisive victory in that struggle to free the Indian past from the coils of epic time, which had begun with the works of the pandits of Fort William College some fifty years ago.''- Ranajit Guha, *Historiography of India, A Nineteenth Century Agenda and its Implications.* 39-40)

রামমোহনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮১৭-১৯০৫) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ***তত্ত্ববোধিনী সভা*** প্রতিষ্ঠা করেন। সভার (১৮১৩) মুখপত্র-রূপে প্রকাশিত হয় *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। বাংলা ভাষায় এই পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল একটি কমিটির ওপর। দেবেন্দ্রনাথ এবং পত্রিকা সম্পাদক অ(য়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছাড়াও এর সদস্য ছিলেন পণ্ডিত ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) প্রমুখ বিদ্বৎজন। ***তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়*** ভারতের সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশিত **প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা** (১৭৭১ শকাব্দ ৭১ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধ এখানে প্রসঙ্গত্র(মে উল্লেখ করা যায়। মার্শম্যান-প্রণীত ভারতের ইতিহাস গ্রন্থের সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ থেকে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত (১৮২৮-১৮৩৬) অংশটি ***বাঙ্গালির ইতিহাস*** নামে অনুবাদ করেন পণ্ডিত ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার আধুনিক ইতিহাস চর্চার উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল যে পরিপ্রে(তে, পরিশেষে তার সামান্য উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতে বৃটিশ শক্তি(র প্রধান কেন্দ্র। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল আগে। আধুনিক ইতিহাস রচনার (ে ত্রেও বাঙালি মনীষীরা দীর্ঘকাল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৯.২ প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারত ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে এদেশের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গু(ত্ব ও মহত্ব অনুধাবন করেন কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষী। প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ বা **ওরিয়েন্টালিস্ট** নামে এঁরা সমধিক প্রসিদ্ধ। আঠার শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম সিকিভাগ পর্যন্ত মোটামুটি এঁদের কার্যকাল। এর আগেও যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপে কোনও কৌতূহল দেখা যায়নি তা নয়। কাশিমবাজার কুঠিতে নিযুক্ত(**জে. মার্শাল** নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে ***ভাগবত পুরাণের*** এক ইংরেজি অনুবাদ করেন বলে জানা যায়। আগ্রা নিবাসী জার্মান মিশনারী **হাইনরিশ রোট** (মৃত্যু ১৬৬৮) একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে তা প্রকাশিত হয়নি। দ(িণ ভারতেও এরকম উদ্যোগের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সেখানে কর্মরত এক ওলন্দাজ ধর্মযাজক **আব্রাহাম রজার** প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে মালাবার অঞ্চলে নিযুক্ত(জেসুইট ধমর্যাজক **জোহান এর্নস্ট্ হানক্সলেডেন** একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তবে তা মুদ্রিত হয়নি। এর ওপর নির্ভর করে প্রায় এক শতাব্দী পরে ঐ একই অঞ্চলের অস্ট্রিয়া দেশীয় ধর্মযাজক **ফ্রা পাওলিনো** লিখেছিলেন দুটি সংস্কৃতি ব্যাকরণ এবং আরও কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এইসব বি(িপ্ত উদাহরণ বাদ দিলে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় পথপ্রদর্শকের কৃতিত্ব ওরিয়েন্টালিস্ট রূপে যাঁরা খ্যাত তাঁদেরই প্রাপ্য। কর্মসূত্রে এঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত(। তাঁদের অবদান কেবলমাত্র জ্ঞানরাজ্যেই সীমিত ছিল না। এর একটি প্রায়োগিক দিকও ছিল। ভারতবর্ষের মতো বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ শাসনের জন্য এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, আচারানুষ্ঠান, বি(্বাস ও ধর্মমত প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা করা ছিল জ(রি। ওরিয়েন্টালিস্টদের রচনা ও অনুসন্ধান এই প্রয়োজন সাধনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। **ওয়ারেন হেস্টিংস** গভর্নর জেনারেল থাকাকালে (১৭৭৪-১৭৮৫) মুক্ত(হস্তে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

আলোকপ্রাপ্তির যুগে (Age of Enlightenment) পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বাইরে যেসব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, ইউরোপীয়দের সে সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। ফরাসী দার্শনিক **ভলতেয়ার** (১৬৯৪-১৭৭৮) একটি গ্রন্থে পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন। এতে তিনি হিন্দু সভ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রণজিৎ গুহ কর্তৃক ***A Rule of Property for Bengal*** গ্রন্থে উদ্ধৃত *আলেকজান্ডার ডাও* তাঁর History of Hindostan (3vols, 1768-72) গ্রন্থে বলেন—এশিয়ার যেসব দেশ ইংরেজরা অধিকার করেছে কিংবা যেগুলির সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে সেখানকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা বা ধর্মমত বিষয়ে অনুসন্ধান না করার কারণে ভাবীকাল বোধহয় তাদের অপরাধী জ্ঞান করবে। (''Posterity will perhaps find fault with the British for not investigating the learning and the religious opinions which prevail in those countries in Asia into which either their commerce or their arms have penetrated'')

হেস্টিংস ছিলেন ভারত বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি প্রথম এদেশে আসেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে যান। বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর ১৭৭২ সালে তাঁকে এই রাজ্যের গভর্ণর (১৭৭৪ সালে গভর্নর জেনারেল) নিযুক্ত(করা হয়। (১৭৭৪ সালে গভর্নর জেনারেল) কোম্পানির কর্তৃপ(কে লেখা এক চিঠিতে (১১ই নভেম্বর ১৭৭৩) তিনি বলেন—কোনো ব্যবসায়িক সংস্থার প(ে এত বড় সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এজন্য ভারতীয়দের সাহায্য প্রয়োজন। হেস্টিংসের উদ্যোগে কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করে তাঁরা আইন সংত্র(ান্ত

প্রয়োজনীয় বিধি ''বিবাদ-ভঙ্গার্ণব'' নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত করেন। ফরাসী ভাষায় সেগুলি অনুদিত হয়। পরে তা *A Code of Gentoo Laws* নামে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করেন **ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড** (১৭৫১-১৮৩০)। অত্যন্ত দ(তা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে মূলের প্রতি বি(্বস্ত থেকে এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে বলে ভূমিকায় হেস্টিংস মন্তব্য করেন। গ্রন্থটির তাৎপর্য প্রকাশমাত্র অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এডমন্ড বার্ক মন্তব্য করেন ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন আইন এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত(হয়েছে (''probably a compilation of the most ancient laws in the world'')। এর দু বছর পর হালহেডের *Grammar of Bengal Language* মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের জন্য প্রথম বাংলা ভাষায় ছাপার হরফ তৈরি করেন হুগলির **পঞ্চানন কর্মকার**।

১৭৭৩ সালে অক্সফোর্ড বি(্বিদ্যালয়ে ফারসী ভাষা শি(াদানের জন্য হেস্টিংস একটি পদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। ব্যক্তি(গতভাবে হেস্টিংস কেবল ফারসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না। স্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে (২০ শে নভেম্বর ১৭৮৪) গীতা পাঠের ফলে তিনি কিরকম অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সে কথা জানান। ভারতের চিত্রশিল্প এবং পাণ্ডুলিপি সংগ্রহেও তাঁর আগ্রহ ছিল। ১৭৮১ সালে তিনি কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হলহেডের *A Code of Gentoo Laws* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেন, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সৌহার্দ্য র(ায় সবচেয়ে সাহায্য করে ধর্মসহিষ্ণু(তা এবং প্রচলিত আইন ব্যবস্থা অবলম্বন—যত(ণ পর্যন্ত না তা শাসকদের স্বার্থ বা আইনের বিরোধিতা করে। (''Nothing can so favourably conduce to these two points as a well-timed toleration in matters of religion and adoption of such original institutes of the country, as do not immediately clash with the laws or interests of the conquerors.'')

হেস্টিংসের কাছে ওরিয়েন্টালিস্টদের ঋণের সীমা ছিল না। হলহেডকে তিনি উৎসাহ দান করেছিলেন। আগেই সে কথা বলেছি। ইংরেজিতে ***গীতা*** অনুবাদ করতে সংস্কৃত ভাষা বিশারদ **চার্লস উইলকিন্স**-কে তিনি প্রণোদিত করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার হেস্টিংসের নির্দেশে কোম্পানি বহন করে। ''ইম্পে'' কোড **উইলিয়াম চেম্বার্স** ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এই কাজের জন্য তিনি প্রতি মাসে দু হাজার টাকা পেতেন। জোনাথন ডানকান ঐ কোড বাংলায় অনুবাদ করার জন্য পনের হাজার টাকা পেয়েছিলেন ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে। হেস্টিংসের সাহায্য ও উৎসাহে **ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন** প্রকাশ করেন *A. Compendious Vocabulary English and Persian* (১৭৮০) এবং **আবুল ফজল** কৃত **আইন-ই-আকবরী**-র ইংরিজি অনুবাদ (১৭৭৭-১৭৮৬) **কর্ণেল জেমস রেনেল** ভারতের যে মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলেন তা সম্ভব হত না হেস্টিংসের সাহায্য ছাড়া। রাজনীতির পাশাপাশি ভারতে যুক্তি(এবং নৈতিকতার মানোন্নয়নে হেস্টিংস সচেষ্ট ছিলেন। একথা বলেছেন তাঁর জীবন চরিতকার জি. আর গে-ইগ, ''He laboured, in short, to promote not only the political but the moral and rational improvement of the provinces.'' Thomson এবং Garret বলেন—''He (Hastings) loved the people of India and respected them to a degree no other British ruler has ever equalled.'' **ডেভিড কফ** বলেছেন— ''His basic convictions became the credo of the Orientalist movement: to rule effectively one must love India, to love India one must communicate with her people and to communicate with her people one must learn their languages.''

প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির যে পরিবেশ হেস্টিংস গড়ে তোলেন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা একটি সংগঠিত রূপ লাভ করে। প্রতিষ্ঠানের ল(্য ছিল এশিয়া মহাদেশে মানুষ

এবং প্রকৃতির যা কিছু সৃষ্টি তার অনুসন্ধান করা। (''The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia and within these limits its enquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature.'') কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার আগে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ পণ্ডিতেরা বাটাভিয়া-য় এরকম একটি সোসাইটি গঠন করেছিলেন। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার **রবার্ট চেম্বার্স** (১৭৩৭-১৮০৩), **স্যার জন শোর (১৭৫১-১৮৩৪)** এবং সংস্কৃত ভাষায় **সুপণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স।** একই আদর্শের অনুসরণে ১৮২২ খৃস্টাব্দে পারী নগরীতে **সোসিয়েতে আশিয়াটিক** এবং ১৮২৩ খৃস্টাব্দে লন্ডনে **রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড** প্রতিষ্ঠিত হয়। **আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি** এবং **জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি** যথাত্র(মে ১৮৪২ এবং ১৪৪৪-এ স্থাপিত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্যার **উইলিয়াম জোন্স**-এর (১৭৪৬-৯৬) নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও এ(ত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের অবদান কারও চেয়ে কম ছিল না। সভাপতিরূপে তাঁর নাম প্রথমে প্রস্তাবিত হলেও কর্মব্যস্ততার কারণে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না বুঝে তিনি এতে রাজি হননি। তাঁর অনুরোধে স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী সোসাইটির প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে সোসাইটির সাধারণ সভায় প্রাচ্য-বিদ্যার কোন না কোন বিষয়ে জোন্স ভাষণদান করতেন। ১৭৮৪ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট দশটি বক্তৃ(তা করেন। তাঁর প্রথম দুটি বছরের বক্তৃ(তার বিষয় ছিল যথাত্র(মে *On the Orthography of Asiatik Words* এবং *On the Gods of Italy, Greece and India*। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বাৎসরিক ভাষণে হিন্দুদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রথম জোন্স বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন পারসিক ভাষা জেন্দ এবং সংস্কৃত একই মূলোদ্ভূত। তাঁর এই উক্তি(র মাধ্যমে ইউরোপে তুলনামূলক ব্যাকরণ শাস্ত্রের চর্চার সূচনা।

আরবী, ফারসী এবং চীনা জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গেও জোন্স আলোচনা করেন। সোসাইটির মুখপত্র ***এশিয়াটিক রিসার্চেস*** পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃ(তা এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। শু(থেকেই পত্রিকাটি বিভিন্ন গবেষণাধর্মী রচনায় সমৃদ্ধ ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় সাধনে জোন্স গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে মহাকবি কালিদাস বিরচিত ***অভিজ্ঞান শকুন্তলম*** নাটকটি তিনি ইংরেজিতে ***Sacontala or the Fatal Ring*** নামে অনুবাদ করেন। ইতিপূর্বে সংস্কৃত কোন নাটক ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়নি। কালিদাসের রচনাকে জোন্স সর্বপ্রথম বহির্বি(ে প্রচার করেন। তাঁর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে গেঅর্গ ফরস্টার জার্মান ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাকবি গ্যেটে তা পড়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বলেন, যদি কেউ বসন্তের ফুল ও পরিণত ফল এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের দুর্লভ সমাবেশ একত্রে দেখতে চায় তবে তাকে শকুন্তলা পাঠ করতে হবে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণু(শর্মা রচিত *হিতোপদেশ* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ জোন্স প্রকাশ করেন। কালিদাসের *ঋতুসংহার কাব্যটি* তাঁর সম্পাদনায় পরে প্রকাশিত হয়। এটি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যটিও জোন্স ইংরেজিতে সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন। চার্লস উইলকিন্স *মনুসংহিতার* অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থের মাত্র এক তৃতীয়াংশ অনুবাদ করতে পেরেছিলেন। তাঁর আরব্ধ কাজ জোন্স সমাপ্ত করেন। জোন্সের মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১৭৯২)।

১৭৮৭ খৃস্টাব্দে জোন্স গু(তর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগশয্যায় ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং উদ্ভিদ-বিদ্যার গবেষণার জন্য প্রচুর তথ্যসংগ্রহ করেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডে ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি পত্রে তিনি জানান উদ্ভিদ-বিদ্যা-চর্চা এবং সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন তাঁকে সবচেয়ে আনন্দ দেয়। আধুনিক ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে জোন্সের নাম চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী **ডাঃ উইলিয়ম রক্সবার্গ** ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত অশোক বৃ(ে র ''জোনিসিয়া অশোক'' *(Jonesia Asoka)* নামকরণ করেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বৃ(টি এই নামেই পরিচিত। ভারতের অতীত ইতিহাস, ভূ-বৃত্তান্ত, হিন্দু সঙ্গীত এবং প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও জোন্স অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই সব বিষয়ে গবেষণার (ে ত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক।

জোন্সের পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম সংস্কৃত পন্ডিত রূপে **হেনরি টমাস কোলব্রুক** (১৭৬৫-১৮৭৩) প্রসিদ্ধ। ১৭৮৩ সালে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটার পদে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়েস ছিল আঠার। ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে তখনও তাঁর মনে কোনরূপ আগ্রহের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু স্যার উইলিয়ম জোন্স এবং চার্লস উইলকিন্সের দৃষ্টান্তে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার (ে ত্রে সরকারি আনুকূল্য তাঁকে উৎসাহিত করে, যেহেতু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁর পরিবার স্বচ্ছল ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কোলব্রুক সংস্কৃত বিভাগের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনেও তাঁর দ(তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১০ সালে দেওয়ানী আদালতের বিচারকরূপে তিনি নিযুক্ত(হন। চার বছর পর তিনি এই আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। পরে তাঁকে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য এবং (১৮০৭-১২) বাংলা রাজস্ব বোর্ডের সদস্য পদে দেখা যায়।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুক এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮১৫ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত(ছিলেন। সোসাইটির মুখপত্র Asiatick Researches পত্রিকায় তাঁর সবশুদ্ধ ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হিমালয়ের উচ্চতা নির্ধারণ এবং গঙ্গানদীর উৎস সম্পর্কে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জৈনধর্ম বিষয়ে আধুনিক গবেষণার তিনি পথিকৃৎ। সহমরণ প্রথার বি(দ্ধে রামমোহনের লেখনী ধারনের দুই দশক পূর্বে ১৭৯৫ সালে On the Duties of A Faithful Hindu Widow নামক প্রবন্ধে কোলব্রুক দেখান হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রথার সমর্থন সূচক কোনও নির্দেশ হিন্দুশাস্ত্রে নেই। ১৮০৫ সালে প্রকাশিত On the Vedas নামক তাঁর অপর এক নিবন্ধ সম্পর্কে বিখ্যাত জার্মান পন্ডিত উইন্টাররিৎস্ বলেন—এই রচনা বেদ সম্পর্কে বর্তমান কালে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পথপ্রদর্শক। ১৮৫৯ সালে *Calcutta Review* পত্রিকায় বেদ সম্পর্কে কোলব্রুকের গবেষণাকে বলা হয়— ''the most valuable contribution to Indian literature that has yet been made. He walked with a firm foot and a clear eye through the quicksands and has marked out the path most distinctly for those that followed.''

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বিরচিত ''বিবাদ ভঙ্গার্ণব'' হিন্দু আইন সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। জোন্স গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে শু(করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোলব্রুক এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। ১৭৯৭-৯৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সমগ্র কাজটির জন্য তিনি কোনরূপ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেননি। এই দায়িত্ব পালনের জন্য স্বয়ং গভর্নর জেনারেল তাঁর প্রশংসা করেন। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থটির নাম ***A Digest of Hindu Law on Contracts and Succession***। বইটি পূর্বে প্রকাশিত হলহেডের ***Code of Gentoo Laws***-এর তুলনায় কোলব্রুকের রচনা অধিক গু(ত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। সংস্কৃত *হিতোপদেশ*

ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা ছাড়াও কোলব্রুক ঐ ভাষায় *অমরকোষ* নামে সংস্কৃত অভিধান সম্পাদনা করেন। তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে **ম্যাক্সমুলার** বলেন, ''though it (Colebrooke's *Grammar*) was never finished, it will always keep its place like a classical torso, more admired in its unfinished stage than other works which stand by its side, finished, yet less perfect.'' জ্ঞান বিজ্ঞানের ((ত্রে এশিয়ার অবদানের জন্য পাশ্চাত্যবাসীদের কৃত(থাকা উচিত বলে কোলব্রুক মনে করতেন। এশিয়ার অতীত উদ্ধারে ইউরোপীয়দের উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান তিনি। হিন্দুশাস্ত্রে একে(রবাদের প্রতি তিনি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন।

১৮১৫ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পরেও কোলব্রুকের ভারত-বিদ্যা সম্পর্কিত অনুসন্ধানে ছেদ পড়েনি। হিন্দু গণিত এবং ভারত বিদ্যা সংত্র(ান্ত তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ এই সময় ইংল্যান্ডের Geographical Society এবং Astronomical Society পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮১৭ সালে কোলব্রুক ভারতীয় বীজগণিত, গণিত এবং পরিমিতিবিদ্যা সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ ইংল্যান্ডের কোয়ার্টার্লি জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সালে কোলব্রুক তাঁর যাবতীয় পুঁথি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিকে দান করেন। দশ হাজার পাউন্ড মূল্যে তিনি এই সকল পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৮২৩ সালে লন্ডনে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ার্ল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম উদ্যোত্ত(া ছিলেন কোলব্রুক। তাঁকে সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলেও তিনি পরিচালকের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করতে রাজি হয়েছিলেন। ১৮২৩-২৮ সালের মধ্যে কোলব্রুক ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পাঁচটি দীর্ঘ নিবন্ধ এখানে পাঠ করেন। এগুলি পরে সোসাইটির *Transactions*-এ প্রকাশিত হয়।

জোন্সের তুলনায় কোলব্রুকের অবদান ম্যাকসমুলারের বিচারে অধিক গু(ত্বপূর্ণ। যেখানে জোন্সের অনুসন্ধান কতগুলি বিষয়ে মাত্র সীমিত, সেখানে কোলব্রুক ব্যাকরণ, দর্শন এবং বৈদিক সাহিত্যের মত বিভিন্ন দূরূহ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পন্ডিতদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মাত্র তাঁকে অতিত্র(ম করতে স(ম হয়েছেন বলে ম্যাকসমুলার মন্তব্য করেছেন, (''few scholars were able to go beyond Colebrooke'')। তাঁর আরও বত্ত(ব্য, জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করলে কোলব্রুকের নাম প্রতিষ্ঠানগুলির গায়ে স্বর্ণা(রে লেখা থাকত। উত্তরকালে কোলব্রুকের পুত্র **স্যার টমাস এডোয়ার্ড কোলব্রুক** (১৮১৩-১৮৯০) তিনবার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পিতার ন্যায় ভারত-বিদ্যাবিশারদ না হলেও ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রচুর আগ্রহ ছিল। পার্লামেন্টের সদস্যরূপে তিনি সর্বদাই ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করতেন। তাঁর চেষ্টায় কোলব্রুকের নিবন্ধগুলি *Miscellaneous Essays* নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ পূর্তি উপল((প্রকাশিত স্মরণিকায় কোলব্রুককে সোসাইটির প্রথম পর্যায়ের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক **রাজেন্দ্রলাল মিত্র** বলেন, ''As a great mathematician, zealous astronomer and profound Sanskrit scholar, he wrote nothing that did not at once command the high attention of the public and not with standing the great advance that has been made in Oriental researches of late years, his papers are still looked upon as models of their kind.''

প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার এবং তার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনার কাজে **চার্লস উইল্কিন্স** (১৭৪৯-১৮৩৬) ভারত-তত্ত্ববিদদের মধ্যে অগ্রগণ্য মুঙ্গেরে প্রাপ্ত পঞ্চম পালরাজ বিগ্রহপাল দেবের একটি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করে তিনি তার অনুবাদ *এশিয়াটিক রিসার্চেস্* পত্রিকার ১ম খণ্ডে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত করেন।

ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎ সংস্থা রয়াল সোসাইটি তাঁকে সদস্য পদে বরণ করে। পরে তিনি দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিপিরও পাঠোদ্ধার করেন। বাংলা এবং ফারসী ভাষায় তিনি টাইপ নির্মাণ করেন। কোম্পানির ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে উইল্‌কিন্স তার দায়িত্বে নিযুক্ত(হন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে উইল্‌কিন্স ভারত ত্যাগ করেন।

কোলব্রুক দেশে ফিরে দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন এবং নিজ গৃহে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই সময়ে ইউরোপে দেবনাগরী অ(রে সংস্কৃত কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে প্রকাশিত তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থটি ছাত্রোপযোগী বিবেচিত হয়েছিল। সংস্কৃত *হিতোপদেশ* এবং *মহাভারত* অবলম্বনে শকুন্তলার কাহিনি উইলকিন্স ইংরেজিতে শোনান। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপু সুলতানের পতনের পর তাঁর বিরাট গ্রন্থাগার লন্ডন শহরে আনা হয়। অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত আরও কিছু পাণ্ডুলিপি নিয়ে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে একটি লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। উইলকিন্স এর গ্রন্থগারিক নিযুক্ত(হন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির শি(ানবিশদের জন্য **হেল্‌বেরি কলেজ** প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে প্রতিষ্ঠানটির পরিদর্শক নিযুক্ত(করা হয়। পরী(ায় ছাত্রদের মূল্যায়নের দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তায়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে উইল্‌কিন্স সংস্কৃত ভাষায় ধাতু সম্বন্ধে একটি ব্যাকরণ *(ধাতু মঞ্জরী)* রচনা করেন। লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। দেশে বিদেশে তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বি(বিদ্যালয় তাঁকে **ডক্টর অফ সিভিল ল** উপাধি প্রদান করে। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁকে **নাইট** উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে উইলকিন্স লন্ডনে পরলোক গমন করেন।

পাশ্চাত্য ভারতবিদ্যা বিশারদদের মধ্যে **হোরেন হেম্যান উইলসন** (১৭৮৬-১৮৬০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানির চিকিৎসক হয়ে তিনি প্রথম ভারতে আসেন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। উত্তরকালে তিনি কলকাতায় মিন্টের 'ডেপুটি এসে-মাস্টার' পদে নিযুক্ত(হয়েছিলেন। কলকাতায় **জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন** এবং সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে (১৮২৩), তিনি তাঁর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। হিন্দু কলেজ পরিচালনার (ে ত্রে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বি(বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শি(ার জন্য বোডেন অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হলে তিনি প্রথম তা অলঙ্কৃত করেন। চার বছর পর তিনি ইন্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত(হন। ব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে উইলসন তার সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুকের মৃত্যুর পর তিনি প্রতিষ্ঠানটির ডিরেকটর নির্বাচিত হন।

সংস্কৃত কাব্যনাটকের রীতিসম্মত আলোচনার জন্য উইলসন স্মরণীয়। পুরাণের অনুবাদ ও বি(ে-ষণে তাঁর পারদর্শিতা প্রকাশ পায়। কলহন - কৃত *রাজতরঙ্গিনী* গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেন। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের বিবরণ সংগ্রহ এবং ভারতীয় (ে াদিত লিপি ও মুদ্রা চর্চায় উইলসনের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদিক গবেষণার (ে ত্রে তাঁর প্রধান কাজ সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে নিত খণ্ডে *ঋগ্বেদ সংহিতার* ইংরেজি অনুবাদ। উইলসনের সংস্কৃতবিদ্যায় কোলব্রুকের গভীরতা ও বিচারশীলতা না থাকলেও ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে উইলসনের আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁকে রামমোহনের ঘনিষ্ট করে তুলেছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে উইলসনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রানুবাদের কাজে রামমোহন এই অভিধানখানি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে উইলসন তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকায় শংকরাচার্যের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে রামমোহনের কাছে ঋণ স্বীকার করেন।

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় হেস্টিংসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন **জোনাথন ডানকান।** ১৭৭২ সালে তিনি কোম্পানির রাইটার পদে যোগদান করেন। কর্ণওয়ালিসের আমলে তিনি ফারসী ভাষার অনুবাদক এবং রাজস্ব

বিভাগের সচিব পদে নিযুক্ত(হন। বারাণসীর রেসিডেন্ট থাকাকালীন সেখানকার এক রাজপুত গোষ্ঠীর মধ্যে শিশু কন্যা হত্যার অমানবিক প্রথা তিনি গোষ্ঠী প্রধানদের বুঝিয়ে রোধ করতে স(ম হন। তাঁর উদ্যোগে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ***Asiatick Researches*** পত্রিকায় তাঁর কতগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৭৯৩ সালে বারাণসীর উপকণ্ঠে প্রাপ্ত দুটি মৃৎপাত্র সম্পর্কে তাঁর রচনা। এই রচনাটি প্রকাশের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে সারনাথকে সনাক্ত(করা সহজ হয়।

প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে **ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ** স্থাপিত হয়। এর আগে ঐ বছর ১০ই জুলাই ১৮ আগস্ট তারিখে কোম্পানির কর্তৃপ(কে লেখা দুটি প্রতিবেদনে প্রতিধ্বনিটির গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। ভারতে আগত কোম্পানির প্রতিটি সিভিলিয়ানের এখানে তিন বছর শি(াগ্রহণ আবশ্যিক ছিল। এখানকার দীর্ঘ পাঠ্যসূচীর তালিকায় ছিল আরবী, ফারসী, কন্নড়, সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, বাংলা, তেলেগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, প্রভৃতি ভাষা, হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশাস্ত্র, দেওয়ানী ব্যবহারবিধি (civil jurisprudence), বিভিন্ন দেশের আইন, অর্থনীতি (বিশেষত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও স্বার্থ সং(-ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ), ভূগোল ও গণিতশাস্ত্র, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ, গ্রীক, লাতিন এবং ইংরেজি ক্লাসিকাল সাহিত্য, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা। ওয়েলেসলি আশা করেছিলেন এই শি(ার মাধ্যমে কোম্পানির সিভিলিয়ানরা ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় জীবনচর্যার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠবে, শাসননীতিতে যার প্রতিফলন ঘটবে। প্রাচ্যবিদ্যা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অস্বীকার করা যায় না। প্রথম যুগে কলেজে অধ্যাপকদের তালিকায় বিশেষভাবে যাঁদের নাম উল্লেখাযোগ্য তাঁরা হলেন **হেনরি টমাস কোলব্রুক** (সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ও হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র), **জে. বি. গিলত্র(াইস্ট** (হিন্দুস্তানী), **এন্. বি. এডমনস্টোন, ফ্রান্সিস গ্ল্যাড্উইন** (ফারসী ভাষা ও সাহিত্য), জন বেইলি (আরবী, ফারসী ও মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র), প্রভৃতি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ এবং অন্যদিকে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরী-মার্শম্যান প্রমুখের মিলিত কর্ম(ত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোম্পানির কর্তৃপ(প্রতিষ্ঠানটির গু(ত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের **হলেবেরিতে** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদের শি(ার জন্য এক কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গু(ত্ব কমতে শু(করে। পরে বেন্টিঙ্কের আমলে শি(া(ত্রে পাশ্চাত্যপন্থীদের জয়লাভের পর কলেজ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কাউনসিলের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য একটি সংস্থা গঠিত হয়। এখান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছিল রামায়ণের অনুবাদ, কোলব্রুক সম্পাদিত *অমরকোষ, হিতোপদেশ, দণ্ডীর দশ কুমারচরিত* এবং *ভর্তৃহরির শতকত্রয়* ইত্যাদি সংস্কৃত আরবী, ফার্সী, বাংলা, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি ভাষাসমূহে এবং এমন কি চীনাভাষাতেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প(থেকে অতি ব্যাপক ও অনেকাংশে সফল প্রকাশন-কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। উইলিয়ম কেরির তত্ত্বাবধানে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যরীতির বিশেষ উন্নতি হয়।

উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪), **যশুয়া মার্শম্যান** (১৭৬৬-১৮৩৭) এবং **উইলিয়াম ওয়ার্ড** (১৭৬৯-১৮২৩) -এর নেতৃত্বে **শ্রীরামপুর মিশন** স্থাপিত হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। কেরী এবং মার্শম্যান ছিলেন বহু ভাষাবিদ। ভারতে খিস্টধর্ম প্রচার তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও শ্রীরামপুর মিশনারিরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সেই সব ভাষার গদ্যসাহিত্যে তাঁরা

প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কেরীর রচনা তালিকার দিকে তাকালে দেখি তিনি ব্যাকরণ লিখেছিলেন বাংলা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলুগু, কন্নড় এবং (মার্শম্যানের সহযোগিতায়) ভুটানী ভাষায়। বাংলা এবং মারাঠী ভাষায় তিনি অভিধান প্রণয়ন করেন। তাছাড়া তিনি সংস্কৃত ভাষার একটি অভিধান এবং তেরটি ভারতীয় ভাষার একটি শব্দকোষ প্রস্তুত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেগুলি আগুনে পুড়ে যায়। মার্শম্যানের সহযোগিতায় মূল বাল্মীকি রামায়ণের আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডর ইংরেজি অনুবাদ কেরি এবং মার্শম্যানের অপর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। *অমরকোষ* ও *হিতোপদেশ* সম্পাদনায় কেরী কোলব্রুককে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮০১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত সংস্কৃত, বাংলা এবং মারাঠী ভাষার অধ্যাপকরূপে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত(ছিলেন। ১৮০৬ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেরী এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান এবং কৃষিবিদ্যায় কেরির যথেষ্ট কৌতূহল ও অধিকার ছিল। এদেশে এইসব বিষয়ের চর্চায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া চলে। কেরী এবং মার্শম্যানের সহযোগী **উইলিয়াম ওয়ার্ড** ছিলেন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় শ্রীরামপুরে প্রাচ্যভাষাসমূহের হরফ ঢালাইখানা ও ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। এশিয়া মহাদেশে তাঁর তুলনা ছিল না। ১৮০১ থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এখানে ২,১২০০০ বই ছাপা হয়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রূপে উত্তরকাল তাঁকে মনে রেখেছে *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos* (চারখণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১১) এবং *A View of History, Literature and Mythology of the Hindoos* (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১৮) নামক গ্রন্থের জন্য।

উপনিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে কেবলমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের মনে ভারতের ইতিহাস উদ্ধারের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এমন ভাবা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে তাদের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার যোগ অনস্বীকার্য। ভারততত্ত্ব **(ইন্ডোলজি)** সন্ধানে ইংরেজ মনীষীরা যেমন অগ্রসর হয়েছিলেন, সেরকম নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের পর ঐ দেশের পুরাবৃত্ত চর্চার প্রথম পর্যায়ে ফরাসী পণ্ডিতের উদ্যোগ রীতিমত চোখে পড়ে। ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনের ৫(ত্রে ওলন্দাজ এবং ফরাসী গবেষকদের যথাত্র(মে একই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরণের গবেষণা কার্যের বিকাশ ঘটেছিল ঠিকই। কিন্তু কেবলমাত্র জাগতিক পুরস্কারের আশায় পণ্ডিতসমাজ আকৃষ্ট হয়েছিলেন বললে তাঁদের প্রতিভার অবমাননা করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বহু পরিচয় তাঁদের রচনা ও কর্মে ছড়িয়ে রয়েছে। রোমান্টিক ভাবান্দোলনের প্রভাবে একদিকে যেমন তাঁরা অতীতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, সেরকম অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহির্ভূত অন্যান্য যেসব সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আঠার শতকে ভলতেয়ার প্রমুখের লেখায় বিশ্বেবী(ার সূচনা হয় তার প্রতিফলনও তাঁদের লেখায় দেখি। ভারতবিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ তাঁরা। বেন্টিঙ্কের আমলে কোম্পানির শি(ানীতি প্রণয়নে শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যপন্থীদের কাছে তাঁদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

৯.৩ মিলের ইতিহাস এবং প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র

শিল্প বিপ-বের পর্যায়ে ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে উপযোগিতাবাদী রাষ্ট্রদর্শনে (Utilitarianism)। এই তত্ত্বের প্রথম বিস্তৃত অলোচনা মেলে ইংরেজ দার্শনিক **জেরেমি বেন্থাম** (১৭৪৮-১৮৩২) রচিত *A Fragment on Government* গ্রন্থে (১৭৭০)। আঠার শতকের অভিজাততন্ত্রের বিরূদ্ধে যুক্ত(রাষ্ট্রের

স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭২-১৭৭৬) এবং ফরাসী বিপ্-ব যে তোপ দাগে তাতে উদারনৈতিক মতবাদের জয় হয়। বেন্থামের দর্শন এই নতুন যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মূল কথা হল সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ সুখবিধান। উপযোগিতার মাপকাঠিতে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। উপযোগিতার সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনি বলেন— "It is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right or wrong." রাষ্ট্রগঠনের পিছনে কোনোরূপ চুক্তি(আছে বলে বেন্থাম মনে করেন না। মানুষের প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং সে প্রয়োজন নিবৃত্তিতে রাষ্ট্রের সার্থকতা বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন। অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যা-কিছু অন্তরায় তার সংস্কার করা উচিত। বিচার পদ্ধতি সরলীকরণ এবং বিচারালয়ের উপযোগিতা বৃদ্ধির ওপর তিনি জোর দেন। সরকার স্বৈরাচারী না গণতান্ত্রিক তার একমাত্র বিচার হতে পারে তা কিভাবে অধিকার ও কর্তব্য পালন করে তার দ্বারা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে সকলের সমান ভোটাধিকার এবং একটি শি(ত নির্বাচক মণ্ডলী প্রয়োজন। শক্তি(শালী নিরঙ্কুশ সার্বভৌম (মতায় তিনি বি(্বাসী ছিলেন। যুক্তি(ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তিনি পথ চলতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে কোনোরূপ শি(াগ্রহণ করা যায় বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর চিন্তাপদ্ধতি বি(ে-ষণ করতে গিয়ে রাষ্টচিন্তার ইতিহাসের এক অভিজ্ঞ পর্যবে(ক মন্তব্য করেন—"The critical faculty was most conspicuous in his intellectual equipment, while respect for the antique and the historical *per se* was entirely lacking." (Dunning, *A History of Political Theories.*Vol III. 212)

বেন্থামকে ঘিরে বুদ্ধিজীবীদের যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তার অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক **জেমস মিল** (১৭৭৩-১৮৩৬)। ভারতের ইতিহাস রচনায় তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। ১৮০৬ সাল থেকে তিনি নিজেকে একাজের জন্য প্রস্তুত করেন। সমগ্র গ্রন্থটি রচনা করতে তাঁর বারো বছর সময় লেগেছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা *History of British India* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। মিল কখনও ভারতে আসেননি। কিন্তু সে-কারণে তাঁর রচনা কোনোভাবে (তিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর যুক্তি(ছিল এরূপ। প্রথমত, ভারতের মতো বিশাল দেশের সবটা তাঁর প(দেখা সম্ভব হত না। দ্বিতীয়, ভারত বিষয়ে সমসাময়িকদের ধারণা ও সংস্কার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতেন। মিল চেয়েছিলেন ভারত সম্পর্কে প্রকাশিত সমস্ত তথ্যের যথাযথ বিচার করে গ্রন্থ রচনা করতে। ইংল্যান্ডে বসেই সে কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের ভারতের ইতিহাস প্রথম রচনা করেন **রবার্ট ওর্ম।** ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা। *A History of the Military ransactions of the British Nation in Indostan from the year 1745* প্রকাশিত হয়। ১৭৬৯ থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত(ছিলেন। ১৭৮২ সালে *Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Marattoes, and of the English Concern in Indostan from 1659* নামে তাঁর অপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। ওর্ম তাঁর ইতিহাস রচনার জন্য বহু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর এই সংগ্রহ এখনও লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের সম্পদ। **উইলিয়াম রবার্টসন** এই পর্যায়ের অন্য এক ঐতিহাসিক। ১৭৯২ সালে তাঁর লেখা *Historical Disquisition concerning the Knowledge which the Ancients had of India* প্রকাশিত হয়। ওর্ম এবং রবার্টসন প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মিল সেরকম কোন দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। ভারত ইতিহাসের সমগ্র পরিসর ছিল তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত(। ১৮১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ ছয় খণ্ডে এবং আরও পরে ১৮২৬ এবং ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে উইলসন এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। উনিশ শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে মিলের ইতিহাস একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে পঠিত হয়। ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থাকে

প্রভাবিত করার বিশেষ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। ১৮১৯ সালে মিল লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যোগ দেন। কোম্পানির যে-সব কাগজপত্র ভারতে পাঠনো হত সেগুলির প্রধান পরী(কের সহকারী রূপে তিনি নিযুক্ত(হন। (Assistant to the Examiner of India Correspondence) ১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত তিনি ঐ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। সমসাময়িকদের চোখে তাঁর গ্রন্থ কিরূপ মর্যাদা পেয়েছিল তার একটি উদাহরণ ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণের সময় পার্লামেন্টের কমন্স সভায় বিতর্ক চলাকালে **মেকলে**-র উক্তি(— রোম সাম্রাজ্যের পতনের ওপর গিবন-এর গ্রন্থ প্রকাশের পর ইংরিজি ভাষায় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে মিলের রচনা মহত্তম ('The greatest historical work which has appeared in our language since that of Gibbon.'' Quoted in R. C. Majumdar, *Historiography in Modern India.* 8-9)।

মিল ছিলেন বেন্থামের শিষ্য। উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। আগেই বলা হয়েছে এর জন্য তিনি ভারতে আসার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি। যেসব আকরিক সূত্রের ওপর তিনি নির্ভর করেছিলেন সেগুলিকে বি(স্ত বলা চলে না। ওর্মের কাছে তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। **ক্লডিয়াস বুকানন** নামে একজন ভারত-বিদ্বেষী খ্রিস্টধর্ম প্রচারকের সা(্য তিনি উদ্ধার করেছেন। **টেনান্ট** এবং **টাইটলার** নামে দুজন ইংরেজ পর্যবে(কের ভারত সম্পর্কে অগভীর কিছু মন্তব্যের সাহায্য তিনি নিয়েছেন। তথ্য নির্বাচনে তাঁর প(পাতিত্বের প্রতি অধ্যাপক **সি. এইচ. ফিলিপিস** দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আঠার শতকের শেষদিকে ভারতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার করতে আসেন ফরাসী পাদ্রি আবে দু বোয়া। ১৮১৬ সালে তাঁর লেখা *A Description of the Character, Manners and Customs of the people of India* নামক গ্রন্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকাশ করে। এই গ্রন্থে যা কিছু ভারত-বিরোধী তার উল্লেখ মিলের লেখায় পাওয়া গেলেও ভারতীয়দের সমর্থনে যেসব কথা আবে দু বোয়া বলেছেন মিল সেগুলি উদ্ধার করেননি। দৃষ্টি দেননি।

প্রাচীন গ্রীস এবং আধুনিক ইউরোপ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও সভ্যতার বিকাশ ঘটে ছিল বলে মিল মনে করতেন না। এইখানেই ওরিয়েন্টালিস্টদের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় জোন্সের নিষ্ঠা এবং সত্যসন্ধিৎসার প্রশংসা করা সত্ত্বেও আ(পের সুরে তিনি বলতে ভোলেন না এশিয়ার প্রধান দেশগুলিতে উন্নত ধরণের সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে জোন্স পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা চালিত হয়েছিলেন (''It was unfortunate that a mind so pure, so warm in the pursuit of truth, and so devoted to Oriental learning, as that of Sir William Jones, should have adopted the hypothesis of a high state of civilization in the principal countries of Asia.'')। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা বিষয়ে জোন্সের উৎসাহের মূলে দুটি কারণ মিল উল্লেখ করেছেন। প্রথম যা-কিছু আমাদের পছন্দের তা কল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। দুই, ভারতীয়দের প্রতি আচরণে প্রশাসন যাতে আরও সচেতন হয়। সেই উদ্দেশ্যেও জোন্স ইউরোপীয়দের কাছে ভারতীয়দের ভূমিকা বড় করে দেখাতে চেয়েছিলেন। (''Beside the illusions with which the fancy magnifies the importance of a favourite pursuit, Sir William was actuated by the virtuous design of exalting the Hindus in the eyes of their European masters; and thence ameliorating the temper of the government.'')। অধিকাংশের মতো সভ্যতা বিষয়ে জোন্সের কোনো সুসম্বদ্ধ ধারণা ছিল না বলে মিল মন্তব্য করেন (''the term civilization was by Jones, as by most men... attached to no fixed and definite assemblage of ideas.'')। প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা এত উন্নত হলে ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে কি করে তা এমন কুসংস্কার ও আচার সর্বস্বতায় ঢেকে গেল, মিল

তার কুলকিনারা করতে পারেনি। অশি(া, আলস্য, লোভ এবং দুর্নীতিতে ভারতীয় সমাজ ছেয়ে গেছে বলে মিল মনে করতেন। হিন্দুরা বুদ্ধি এবং উন্নত কল্পনাশক্তি(র অধিকারী হলেও বাস্তবোপোযোগী কোনো কিছু উদ্ভাবনের ও সাংসারিক তুচ্ছতার প্রতি অধিক মনোযোগী বলে মিল মন্তব্য করেছেন (''The attention of the Hindu is more engaged by frivolous observance, than by objects of utility.'')। শকুন্তলা কাব্যে জোন্স মোহিত হলেও রচনাটি মিলের হৃদয় স্পর্শ করেনি। প্রাচীন ভারতের শিল্পকর্মে তিনি প্রয়োগ নৈপুণ্যের অভাব বোধ করতেন।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে মিলের মূল্যায়ন ছিল জোন্সের বিপরীত। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের বক্তব্য তথ্য প্রসূত নয় বলে তিনি মনে করতেন। প্রাচীন হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, শিল্প ও বিজ্ঞান, তাদের আইন-কানুন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সব মিলিয়ে আমরা একটি সিদ্ধান্ত করতে পারি তারা ছিল অমার্জিত (''As the manners, the arts and sciences of the ancient Hindus are entirely correspondent with the state of their laws and institutions, everything we know about the ancient state of Hindustan empire conspires to prove that it was rude.'')। প্রয়োগে দীর্ঘসূত্র না হলেও হিন্দু আইন দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার বিচারে পৃথকীকরণ করেনি। তা সর্বত্র স্পষ্ট এবং সুসংহত নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিচার ও আইন সংস্কার উপযোগিতাবাদীদের চোখে অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। এটি ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন (Common law) তাদের মতে ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ব্রিটেনের আইন সংস্কারে উপযোগিতাবাদীরা গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মকে তারা যুক্তি(র আলোকে বিচার করতেন। প্রাচীন ভারতের ধর্মচিন্তায় ঈশ্বরের বিষয়ে উন্নত ধারণার পরিচয় মাঝে মাঝে ল(্য করা গেলেও সাধারণভাবে অশুভ শক্তি(কে প্রতিহত করতে মানুষ বিভিন্নরূপে প্রকৃতি পূজা করত। এই ছিল ধারণা মিলের। সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য এবং পুরোহিততন্ত্রের তিনি সমালোচনা করেছেন। ভারতীয়দের বিনীতভাব তাঁর মতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে থাকার ফল। প্রাচীনকালে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে কেবল মানুষ পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের (ে ত্রেও তার ব্যতিক্র(ম দেখা যায়নি। মধ্যযুগের ইউরোপ গত শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্যবাসীর চোখে ছিল ''অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ'' (Dark Ages)। মিল সেই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু যুগের তুলনায় এমনকি পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিকেও তিনি অনেক উন্নত বলতে দ্বিধা করেননি (''people of Europe even during the feudal ages, were greatly superior to the Hindus.'')। ভারতীয়দের নৈতিকতার মান মিলের মতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তিনি বলেছেন—তারা ক্রীতদাস-সুলভ (''In truth, the Hindu, like the Eunuch, excels in the qualities of a slave... In the still more important qualities which constitute what we call the moral character, the Hindus ranks very low.'') মিলের ভারত ইতিহাস প্রকাশ পায় এমন এক সময়ে যখন ভারতে ব্রিটিশ শক্তি(রূপান্তরিত হচ্ছিল। আঠার শতকের মধ্যভাগ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আধিপত্য বিস্তার করলেও ১৮১৮ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর সর্বশক্তি(মান হয়ে ওঠে। অধ্যাপক পার্সিভাল স্পীয়ার এই পরিবর্তন বোঝাতে বলেছেন— ''The British empire *in* India became the British empire *of* India.'' ভারতের বিশাল ভৌগলিক ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র ল(্য করে কোম্পানির প্রতিনিধিরা— মনরো, এলফিনস্টোন প্রমুখ— এদেশের গভীরে অজানা বিপদের ভয়ে সতর্ক ছিলেন। কোম্পানি কর্তৃপ(ভারতীয় সমাজে হস্তে(প না করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পর কোম্পানির কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন দেখা দিল। ঐতিহাসিক **এরিক স্টোকস** আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের সূচনায় এদেশে অবস্থিত কোম্পানির প্রতিনিধিদের ''রোমান্টিক'' এবং তাদের উত্তরসূরীদের ''উপযোগিতাবাদী'' আখ্যায়িত করেছেন। (দ্রষ্টব্য, Eric Stokes, *The English*

Utilitariaus and India)। উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মিল কোম্পানির ভারত বিস্তারের প্রথম পর্যায়ের প্রশাসকদের নীতির সমালোচনা করতে ছাড়েননি। উদাহরণ স্বরূপ, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মীর কাসিমের শুল্ক বিলোপের সিদ্ধান্তে ইংরেজদের (ুব্ধ প্রতিত্রি(য়ার বর্ণনায় তাঁর মন্তব্য— স্বার্থের প্ররোচনায় মানুষ যে কতদূর ন্যায়-অন্যায় বিচার রহিত ও নির্লজ্জ হতে পারে, এই ঘটনা তার চরম দৃষ্টান্ত। মিল ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচক। ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূস্বামীদের দৃষ্টান্ত দেখে যারা এই বন্দোবস্তের প(মত দেন, তারা আশাহত হবেন বলে তিনি সতর্ক করেছিলেন। কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থা ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান না করেই করা হয়েছিল। মিল বুঝেছিলেন, এর ফলে কৃষকরা আরও শোষিত হবে। ১৮৩১ সালে পার্লামেন্টের সামনে সা(্য দিতে গিয়ে (১১ এবং ১৮ আগস্ট) তিনি বলেন— সরকার যদি সম্পূর্ণ খাজনা গ্রহণ করে, তবে কৃষি-কাজে উৎসাহ কমবে না। এর মূলে ছিল খাজনা (rent) সম্পর্কে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ **রিকার্ডো**-র বক্ত(ব্য ঃ খাজনা হল উদ্বৃত্ত মূল্য, পুঁজি বা শ্রম ছাড়া যা অর্জিত নয়।

উপযোগিতাবাদীরা নিজেদের মন-গড়া ছাঁচে এদেশ শাসন করতে গিয়ে প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেন। রিকার্ডো-র তত্ত্বের বশবর্তী হয়ে ভারতীয় সমাজের প্রভাবশালী অংশের বি(দ্ধাচারণ করা হয়। সমাজে অভিজাত বর্গ এতকাল নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিল। তাদের হঠাৎ (মতাচ্যুত করায় সাধারণ মানুষের মনে (োভ জাগে। অযোধ্যায় বিদ্রোহের পিছনে তালুকদারদের নেতৃত্ব একটি গু(ত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ব্রিটেনে র(ণশীলরা এই ঘটনার জন্য একদিকে মিশনারিদের এবং অন্যদিকে সংস্কারকদের অনেকটা দায়ী করে। হিন্দু কলেজের ছাত্র **কাশীপ্রসাদ ঘোষ** (১৮০৯-১৮৭৩) কলেজ অধ্য(উইলসনের অনুরোধে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী Government Gazette-এ মিলের ভারত ইতিহাসের প্রথম চার অধ্যায়ের সমালোচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধের নাম ছিল (Criticism of Mill's British India)। কাশীপ্রসাদ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, ভারতে রাজশক্তি(প্রাচীনকালে স্বৈরাচারী ছিল না। হিন্দুদের যুগ গণনা পদ্ধতি, প্রাচীন বিচার ব্যবস্থা এবং বর্ণাশ্রম প্রথার তিনি প্রশংসা করেন। উইলসন ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ ও ওরিয়েন্টালিস্টদের অন্যতম। মিলের গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব যখন পরবর্তী সময়ে তাঁর ওপর পড়ে, তখন পাদটীকায় মিলের বক্ত(ব্যের তিনি প্রচুর সংশোধন করেন।

৯.৪ অনুশীলনী

ক) উনিশ শতকে ভারতে ইতিহাস চেতনার প্রকাশ কিভাবে হয়েছিল তাঁর বর্ণনা দিন।

খ) প্রাচ্যবিদ্যা কিভাবে ভারতে নবজাগরণে সাহায্য করেছিল তার বর্ণনা দিন।

গ) সমবাদী দার্শনিক মিলের প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্বটি আলোচনা ক(ন।

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

Ranajit Guha, *Historiography of India.* A Nineteenth Century Agenda and its implications.

David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance.*

R. C. Majumdar, *Historiography in modern India.*

C. H. Philips, ed. *Historians of India. Pakistan and Ceylon.*

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা।*

একক ১০ ❑ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া

গঠন

১০.০ প্রস্তাবনা

১০.১ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া (ভূদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম)

১০.২ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১০.৩ বঙ্কিমচন্দ্র

১০.৪ স্বামী বিবেকানন্দ

১০.৫ অনুশীলনী

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ প্রস্তাবনা

এদেশে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের অবদান নতুন করে উল্লেখ করার অপে(া রাখে না। আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা তাঁদের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর *পুষ্পাঞ্জলি* গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের পূর্বেই দেশমাতৃকাকে দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মারাঠা ইতিহাসের নায়ক শিবাজীর গুণকীর্তন করেছেন ভূদেব এমন এক সময়ে ইংরেজ লেখকদের রচনায় তাকে দস্যু দলপতি হিসাবে চিত্রিত করা হত। চিকাগো ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ থেকে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের জয়যাত্রা বলে অরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনায় বিবেকানন্দ আমাদের পথ প্রদর্শক।

১০.১ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া (ভূদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম)

পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের প্র(ে না করে পারেননি— কিসে এর শক্তি(, কোথায় বা দুর্বলতা, ভারত কেন পরাধীন, জাতি হিসাবে আমাদের কর্তব্য কি? ইতিহাসের পাতায় এর উত্তর খুঁজতে হয় কেবল জ্ঞান পিপাসা মেটাতে নয়,— আত্মপরিচয়ের সন্ধানে। নিছক তথ্যমাত্র নয়, তথ্যকে অতিত্র(ম করে যায় যে কল্পনা তার আশ্রয় নিতে হয়। ঘটনার নিহিত তাৎপর্য এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অন্বেষণে ইতিহাস দেখা দেয় এক নতুন রূপে। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার ঐক্যসূত্র ধরা পড়ে। খন্ডকাল অতিত্র(ম করে দৃষ্টি খোঁজে মানবজীবনের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। ইতিহাসের এই নবরূপ সৃষ্টিতে উনিশ শতকের বাংলায় যেসব মনীষী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন **ভূদেব মুখোপাধ্যায়** (১৯৩৬-১৮৯৪), **স্বামী বিবেকানন্দ** (১৮৬৩-১৯০২) এবং **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৬-১৮৯৪) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

১০.২ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলকাতার বিখ্যাত হরিতকীবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বি(েনাথ মুখোপাধ্যায় সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। পারিবারিক প্রভাব ভূদেবের ওপর বিশেষভাবে পড়েছিল। পরিণত বয়সে *পুষ্পাঞ্জলি* গ্রন্থের ভূমিকায় পিতৃঋণ স্মরণ করে তাঁর নিবেদন ঃ-

''তুমি আমার জন্মদাতা এবং শি(াগু(। আমি তোমার স্থানে যত শি(লাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিচল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তরবাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু অতএব কি সা(াৎ সম্বন্ধে কি পরম্পরা সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার— তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।''

শেষ জীবনে সংস্কৃত শি(াপ্রসারের উদ্দেশ্যে ভূদেব স্বগ্রামে বি(েনাথ চতুষ্পাঠি এবং মায়ের নামে ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় স্থাপন করেন। মৃত্যুর পূর্বে এই দুই সংস্থার আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক তাদের নামে বরাদ্দ করেন।

পিতা চেয়েছিলেন কুলপ্রথানুযায়ী পুত্র সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠুক। কিন্তু ভূদেবের আগ্রহে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। ছাত্রসমাজে মিশনারীদের প্রভাব রোধ করতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেব প্রমুখের উদ্যোগে **হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়** স্থাপিত হল (১৮৪৬) ভূদেব তার প্রধান শি(ক নিযুক্ত(হন। পরে তিনি সরকারি শি(া বিভাগে যোগ দেন এবং ত্র(মশ স্কুল ইনস্পেকটর পদে উন্নীত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এতদিন ঐ পদ ইংরেজদের জন্য সংর(িত ছিল। চাকরি জীবনে ১৮৬৪ সাল থেকে তিনি ***শি(াদর্শন ও সংবাদপত্রসার*** নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি চার বছরের অধিক কাল ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার পরিচালিত এডুকেশন গেজেট পত্রিকার তিনি সম্পাদক হন। অধ্যাপক **প্রমথনাথ বিশি** বলেছেন- 'বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন **বঙ্গদর্শন**, দেবেন্দ্রনাথের যেমন তত্ত্ববোধিনী, অ(য় সরকারের যেমন সাধারণী, **এডুকেশন গেজেটও** তেমনি ভূদেবের বাণীবাহী দূত।' (ভূমিকা, *ভূদেব রচনা সম্ভার)*। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে ভূদেব দেহর(া করেন।

ভূদেবের রচনাগুলিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তক। বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় (১) *পুরাবৃত্ত সার* ঃ মানবসভ্যতার প্রাচীন যুগ এখানে আলোচিত হয়েছে। (২) *ইংল্যান্ডের ইতিহাস* (১৮৬২) ঃ আত্মসম্মান এবং স্বাজাত্যভিমানের (National Pride) কারণে ভূদেব মনে করেন অন্যান্য জাতির তুলনায় ইংরেজ এগিয়ে আছে মহারানী ভিক্টোরিয়া রাজত্বকাল পর্যন্ত ব্রিটেনের রাজা এবং রানীদের ইতিহাস এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। (৩) *রোমের ইতিহাস* (১৮৬৩)। (৪) *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৯০৪) ঃ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালের অবসান (১৮৩৫) থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যের প্রধান ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের আইন সদস্য বেথুন - কর্তৃক এদেশে ব্রিটিশ - বংশোদ্ভূতদের সাধারণ আদালতের অধীনে আনা প্রস্তাবের বি(দ্ধে শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রতি(্রিয়া বর্ণনা এবং নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আমরা ভূদেবের স্বাধীন

সমাজের প্রতিত্রি(য়া বর্ণনা এবং নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আমরা ভূদেবের স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রবন্ধ সাহিত্য। *পারিবারিক প্রবন্ধ* (১৮৮২), *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২), এবং *আচার প্রবন্ধ* (১৮৯৫) গ্রন্থত্রয়ের মধ্য দিয়ে ভূদেব হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির প(যুক্তি(বিস্তার করেছেন। সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় ভূদেব বলেছেন - ''এখনকার ইংরাজী শি(ত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে সব বিষয়েই তথ্যজ্ঞান, অস্ফুট কর্তব্যসুত্র অনির্দিষ্ট এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে।'' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য জাতীয়ভাব বৃদ্ধি এবং জাতি ভবিষ্যত কর্তব্য নির্ণয়। জাতিভেদ প্রথার ওপর হিন্দু সমাজ নির্ভরশীল বলে ভূদেব মনে করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৈষ(বধর্ম এই সত্যের বিরোধিতা করে ত্র(মেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভূদেবের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এই কারণে তিনি বলেছেন—''ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ(ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু সমাজের প্রকৃতি - শান্তি। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপে(া ধর্মভী(এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন।'' ব্রাহ্মণরা আচারনিষ্ঠ এবং সেই কারণেই সমাজে শ্রেষ্ঠ বলে ভূদেব মনে করতেন। ইংরেজ শাসন তাঁর মতে মোটের ওপর দেশের প(কল্যাণকর— ''ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে র(া করিতেছেন, ইহারা সুশাসন করিতেছেন, ইহাকে মিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সম্মিলিত রাখিতেছেন। অতএব ইংল্যান্ড আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার সম্মানের এবং প্রেমের পাত্র হইয়াছেন।'' *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে ভূদেবের ঘোষণা ঃ ''আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করতে চাই না।'' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি ভূদেব সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। পরিসংখ্যান দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন ''ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জমিয়াছে এখানে তাহার নামগন্ধ নাই।'' জাতীয় ভাবের উন্নতি প্রার্থনা করলেও স্বজাতিপ্রেম ভূদেবের মতে সর্বোচ্চ আদর্শ নয়। *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থের শেষে ভূদেবের বক্ত(ব্য ঃ ''সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্যধর্মের সর্ব্বোচ্চ আসন। আর্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙমানসগোচরে নিমজ্জিত করিতে চাহেন।'' সমকালীন হিন্দু সমাজকে তিনি ''জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'' মন্ত্রে দী(া গ্রহণের উপদেশ দেন। জাতীয়ভাবের সঙ্গে ভূদেব এইভাবে সর্ব্বে(রবাদ এবং একাত্মবাদকে মিলিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে নব্য হিন্দু আন্দোলনের পিছনে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, ভূদেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থের প্রশংসা করে রাজনারায়ণ বসু বলেন— ''ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেবভক্তি(এবং সম্মিলনের ও উদ্যমের মহামন্ত্রস্বরূপ।''

তৃতীয়তঃ, উপন্যাস। ১৮৫৭ (?) সালে প্রকাশিত হয় ভূদেবের *ঐতিহাসিক উপন্যাস* গ্রন্থ। এর দুটি কাহিনী লেখক নিজেই জানিয়েছেন কন্টার (Conter) রচিত ইংরেজি আখ্যায়িকা *রোমান্স অফ হিস্ট্রি* থেকে গৃহীত। ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থের প্রথমে রয়েছে ''সফল স্বপ্ন'' নামে উপাখ্যান। এর নায়ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্র সবক্ত(গীন (শাসনকাল ৯৭৭-৯৯৭)। লেখক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থভুক্ত(অপর রচনাটি হল ''অঙ্গুরীয় বিনিময়।'' শিবাজী এবং ঔরঙ্গজেব কন্যা রোশনারার প্রেম বিনিময়কে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। মারাঠা শক্তি(র উত্থানের পিছনে ধর্মভাবকে অন্যতম কারণ হিসাবে লেখক, চিহ্নি(ত করেছেন। তিনি বলেন— ''সকল জাতিরই অভ্যুদয়কালে তত্তৎ জাতীয় জনগণের ধর্মবৃদ্ধি প্রবল হয়। এমনকি সেই জাতীয় অতি - নিকৃষ্ট তামস প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিত তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল।'' মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে শিবাজী উৎসব প্রবর্তিত হবার বহু আগেই ''অঙ্গুরীয় বিনিময়''

কাহিনিতে মারাঠী বীরকে বলতে শুনি— ''আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পার্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি(দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্তবিশ্রুত নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপে(া যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং স(ম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন? আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগমান নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদয় উপত্যকা আত্র(মণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারত রাজ্য প-াবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতে করাকর্ষণ করিবে।'' ভিন্ন রাজ্যে মারাঠারা যে লুণ্ঠনকারী ছিল ভূদেব তা অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, ''যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্রখন্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল।'' শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভূদেব বলেছেন— ''মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরলপ্রকৃত ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি অত্যুদার প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়গনের অন্তঃকরণে হিতৈষিতা উদ্রিক্ত(া করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এইজন্য তাহার চরিত্র লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।''

পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬) গ্রন্থের বিবরণে লেখক বলেছেন, ''কতিপয় তীর্থদর্শন উপল(্যে ব্যাস মার্কন্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য কথন।'' জার্মান মনীষী গ্যেটে-র (Goethe) একটি উক্তি(তিনি শু(তে উদ্ধার করেছেন। ''Ordinary history is traditional, higher history mythical, and highest history mystical.'' ইতিহাস বিষয়ে ভূদেবের মনোভাব এর থেকে বোঝা যায়। এই গ্রন্থে যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ শেষে মার্কন্ডেয় মুনি ব্যাসদেবকে বলেন, ''এ(ণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেপীমূর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইলে।'' **অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী** এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন— ''ভারতভূমিকে দেবী-রূপে কল্পনা বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। পুষ্পাঞ্জলি'র প্রকাশ ১৮৭৬ সালে, 'আনন্দমঠ' রচনার অনেক আগে। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় এ (ে ত্রে 'পুষ্পাঞ্জলি' কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন।'' স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র *পুষ্পাঞ্জলি* গ্রন্থ সম্পর্কে এই ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন- ''হিন্দুবিশ্বাসের যে সকল উপাখ্যান আজ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মুর্খতার পরিচায়ক ও কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত(ভাবিতেন, তাহা পুষ্পাঞ্জলির গ্রন্থাকারের সভক্তি(ক আলোচনায় যে ফল দিয়াছে তাহা ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হীন নহে।''

নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন- ''পৃথিবীতে যত পয়গম্বর বা নরদেব এ পর্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়।'' (ধর্মচর্যা, পারিবারিক প্রবন্ধ) *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৭৬) একটি কল্পকাহিনি। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠারা জয়ী হলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি ঘটতে পারত কল্পনা করে ভূদেব এখানে রোমাঞ্চিত। কনৌজ এবং বারাণসী হত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। কনৌজে এক দিকে গ্রীক লাতিন এবং অন্যদিকে আরবী - ফারসী ভাষার চর্চা হত। আর্ন্তজাতিক ইতিহাসের গবেষণা হত, ভারতের পুন(খান বিষয়ে পন্ডিতেরা মহাকাব্য রচনা করতেন। বারাণসীতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হত। ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেত। ভূদেবের কল্পনা কেবল হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করেনি। *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* গ্রন্থে রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা-দৃশ্যে এক মারাঠা সর্দার নিবেদন করেন—''ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর পর নহেন, ইনি উহাদিগকে আপন ব(ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরা ইহার পালিত সন্তান। এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও

অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব - সম্বন্ধ হয় না? আবশ্যই হয় - সকলের শাস্ত্রমতে হয়।'' র(ণশীলতা এবং আধুনিকতার টানাপোড়েনে ভূদেব চরিত্র জটিলতা লাভ করেছে। রাজনৈতিক চিন্তার (ে ত্রে তিনি ছিলেন সমকালীন কংগ্রেস নেতাদের মতো মডারেট। ব্যক্তি(গত জীবনে হিন্দু আচারানুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। কিসে হিন্দু সমাজের উন্নতি হয় তা ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলন ছাড়া ভারতের ঐক্য র(া যে সম্ভব নয় তা বুঝতে তাঁর ভুল হয়নি।

১০.৩ বঙ্কিমচন্দ্র

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রথম প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূচনা হয়। এই পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস বিষয়ে নটি প্রবন্ধ লেখেন ঃ- ১। ভারত কলঙ্ক (বৈশাখ, ১২৭৯) ২। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (ভাদ্র, ১২৮০) ৩। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (ভাদ্র, ১২৮০, অগ্রহায়ণ, ১২৮২) ৪। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি (আশ্বিন, ১২৮০) ৫। বাঙ্গালির বাহুবল (শ্রাবণ, ১২৮১) ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস (মাঘ ১২৮১) ৭। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) ৮। বাঙ্গালীর উৎপত্তি (পৌষ, ১২৮৭- জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) ৯। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯)। এই তালিকার সঙ্গে যোগ করা যায় *প্রচার* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (শ্রাবণ, ১২৯১)। *বিবিধ প্রবন্ধ* গ্রন্থে পরে প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ

''এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে যে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।- যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারীর ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশি। দর বেশি হউক বা কম হউক পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? *বাঙ্গালিতে* বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,— সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কই, আমিত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি— এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্তা ত শুনিলাম না।'' (ভূমিকা, *বিবিধ প্রবন্ধ,* দ্বিতীয় ভাগ)

ইতিহাস রচনার (ে ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সন্ধান করেছেন। যেমন ''পাল ও সেন রাজশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তির(া কিরূপে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি?... কে বিচার করিত,... রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য্য, পূর্ত্ত, স্বাস্থ্য এসকল কিরূপ ছিল?... কোন ধর্ম কতদুর প্রচলিত ছিল? ...তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্মভয় কিরূপ? ... বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? ... ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত?'' বঙ্কিমচন্দ্রের ''বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'' প্রবন্ধে এই সব প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে **অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের** মন্তব্য ঃ ''তাঁহার মন দেশকালধৃত

ইতিহাসের এই সমগ্ররূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলিয়া মনে হইতেছে।'' (*বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* প্রথম অধ্যায়)। সেকালে এরাজ্যের প্রচলিত ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন বাদশাহ - সুবাদারের ''জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র''। মিল, স্টুয়ার্ট মার্শম্যান, লেখব্রীজ এবং তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকদের পদ্ধতি, অনুসন্ধান ও পরিণাম বিচার তাঁর কাছে অনেক সময় অজ্ঞতা পরজাতিবিদ্বেষ ও বিজিতের প্রতি বিজেতার স্বাভাবিক দম্ভের প্রকাশ মনে হয়েছে। সেই বিদ্বেষ, অসূয়া, ঘৃণা ও অনুকম্পা থেকে বাঙালিকে র(া করার জন্য তিনি ইতিহাসের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। মিন্‌হাজ্‌-উদ্দীন সিরাজ রচিত *তবকৎ-ই-নাসিরি* গ্রন্থে বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গজয়ের কাহিনী তাঁর অমূলক ঠেকেছিল। এ সম্পর্কে (োভ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, ''সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।'' তিনি আরও বলেন, ''যে বাঙ্গালী এ সকলকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।'' এই ভ্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে বঙ্কিম ডাক দিয়েছিলেনঃ ''বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

''তুমি লিখিবে আমি লিখিব, সবাই লিখিবে।''

বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার কিভাবে ঘটল, বঙ্কিম তা-ও জানতে আগ্রহী। এই প্রবন্ধের শেষে তাঁকে বলতে শুনিঃ ''দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্‌ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপে(া গুরতর তত্ত্ব আর নাই।''

উপন্যাসের আধারে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বর্ণনা করেছেন। *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) মুঘলদের বঙ্গবিজয়ের কাহিনি(*কপালকুন্ডলা* (১৮৬৬) জাহাঙ্গীরের সময়ের একটি ঘটনার বিবরণ(বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলা আত্র(মণের পটভূমিকায় রচিত *মৃণালিনী* (১৮৬৯)(*চন্দ্রশেখর*-এর (১৮৭৪) বিষয়বস্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমল থেকে গৃহীত(*আনন্দমঠ*-এর (১৮৮২) পশ্চাৎপটে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর(*সীতারাম* (১৮৮৭) মুসলমান শক্তি(র বি(দ্ধে হিন্দু রাজার বিদ্রোহের কাহিনি(*রাজসিংহ* (চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৩) আওরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুতদের শক্তি(-পরী(া। এইসব উপন্যাস আলোচনাকালে বঙ্কিচমন্দ্রের বি(দ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শোনা গেছে। কিন্তু তা কতখানি যথার্থ পরী(া করে দেখা যেতে পারে। *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে জগৎ সিংহ-এর প্রতি আয়েষার ভালবাসায় অনেক লেখক বঙ্কিমের মুসলমান-বিদ্বেষের গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু তারা ভুলে যান, মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলে বঙ্কিম কখনো অয়েষার মতো নির্মল চরিত্র সৃষ্টি করতেন না। কতলু খাঁ নীচ, বিবেকহীন। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমার চিরত্রের তুলনায় ওসমান ও আয়েষার চরিত্র অনেক বেশি উজ্জ্বল। *কপালুকন্ডলা*-য় মতিবিবি বুদ্ধিমতী কিন্তু হৃদয়হীন ও নৈতিকজ্ঞানবর্জিত। তার কামনার আগুনে নবকুমার দগ্ধ। কিন্তু মেহে(ন্নিসা প্রণয়নিষ্ঠ। কেউ বলবে না যে মুসলমান বলেই মতিবিবিকে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। মৃণালিনী-তে বখ্‌তিয়ার চত্র(ান্তকারী কিন্তু পশুপতি বিশ্বাসঘাতক ও কুচত্রী। চন্দ্রশেখর-এ দলনী প্রতিব্রতা ও আত্মত্যাগে প্রোজ্জল অথচ শৈবলিনী পাপাচারী। মীরকাসিম প্রজাহিতৈষী শাসক ও ব্রিটিশদের বি(দ্ধে সাহসী যোদ্ধা(অথচ তকি খাঁ নীচ। সীতারাম-এ ফকির সাম্প্রদায়িক ও নিষ্ঠুর(কাজী ফকিরের মতো সাম্প্রদায়িক না হলেও বিপজ্জনক। কিন্তু চাঁদ শাহ ফকির বিজ্ঞ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। সীতারামের হিন্দু রাজ্যের নাম বঙ্কিম রেখেছিলেন ''মহম্মদপুর''।

রাজসিংহ উপন্যাসে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে বঙ্কিমের বি(দ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ পুন(খাপিত হয়েছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ছবি চঞ্চলকুমারী যে-দৃশ্যে পদদলিত করেছেন সেখানে বঙ্কিমের মুসলমান বিদ্বেষ প্রকট হয়েছে— এমন মন্তব্যও শোনা গেছে। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন হিন্দুরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করেনি। চঞ্চলকুমারী ছিলেন তাদের প্রতিনিধি যারা ঔরঙ্গজেবকে ঘৃণা করত ও তার পতন কামনা করত। এই উপন্যাস লেখার সময় বঙ্কিম সে সময়ে প্রামাণ্য বলে যে সব পুস্তক বিবেচিত হত, সেগুলি থেকে তথ্য আহরণ করেছেন— যেমন প্রিঙ্গেল কেনেডির 'এ হিস্ট্রি অব দি গ্রেট মোগলস', জেমস টড লিখিত 'দি অ্যানালস অ্যান্ড অ্যানটিকুয়িটিস অব রাজস্থান', ওরম রচিত 'হিস্টরিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টস অব দি মোগল এম্পায়ার', মানুচি রচিত 'স্টোরিয়া দ্য মোগোর', এফ এফ কাট্রো রচিত 'দি জেনারেল হিস্টরি অব দি মোগল এম্পায়ার' প্রভৃতি। রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাসের বিকৃতি যদি কোথাও ঘটে থাকে, তবে সে দায়িত্ব কেবল বঙ্কিমের নয়। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন— ''যদিও বঙ্কিমের যুগে বাদশাহের সহিত রাজসিংহের মহাযুদ্ধের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নাই বা রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহা হইলেও বর্তমানে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পরিপ্রে(িতে বিচার করিলে দেখা যায় যে বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিত্র(ম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।'' ছোটোখাটো ঐতিহাসিক কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে তাঁর মতে বঙ্কিম 'প্রকৃত ইতিহাসকে লঙঘন করেন নাই।'' উপন্যাসের উপসংহারে লেখকের নিবেদন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

''গ্রন্থাকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোনও পাঠক মনে না করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপে(া অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপে(া শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপে(া রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ(অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপে(া রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে— হিন্দু হউক, মুসলমান হউক— সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এ জন্য তিনি (দ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থেব প্রতিপাদ্য।''

আনন্দমঠ উপন্যাস এবং বিশেষত ঐ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত(''বন্দে মাতরম্'' গানকে কেন্দ্র করে উনিশশো ত্রিশের দশকে মুসলমান সমাজের প(থেকে বঙ্কিমের বি(দ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শোনা যায়। কাজী আবদুল ওদুদ, রেজাউল করিম, আনিসুজ্জামান প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে লড়াই প্রকৃতপ(ইংরেজ এবং সন্তানদলের মধ্যে। বঙ্কিম সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন তিনি উপন্যাসে ইংরেজদের নাম না করে ''যবন'' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আবার এ-ও মনে রাখা দরকার যে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা মিলিয়ে সেকালে জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। ''বন্দে মাতরম্'' গানে ''সপ্তকোটি'' শব্দে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে বাংলার মোট জনসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। ''বন্দে মাতরম্'' গানে হিন্দু ধর্মের কোন দেব-দেবী নয়, দেশমাতৃকাকে দেবী রূপে কল্পনা করে বঙ্কিম তাঁর আরাধনা করেছেন। তাই তা কোন প্রচলিত ধর্মের সীমায় আবদ্ধ নয়। বিশেষত মনে রাখা যেতে পারে, উপন্যাসে মহাপু(ষের উক্তি,— ''তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা আর্যধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম।'' বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বলা বোধহয় তাই সঙ্গত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যে মুসলমানদের বি(দ্ধে অহেতুক অপবাদ কিংবা ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত উক্তি(র সন্ধান পাওয়া যায় না। ''ভারত কলঙ্ক'', প্রবন্ধে তিনি ভারতীয়দের গৌরব ও দুর্বলতা দুই-ই বি(ে-ষণ করেছেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর পঁচিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আরবরা একদিকে উত্তর আফ্রিকায় মিশর এবং সিরিয়া পার হয়ে স্পেন এবং অন্যদিকে পারস্য ও তুর্কীস্থান অধিকার করলেও ভারতবর্ষে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মহম্মদ বিন্ কাসিমের হিন্দু জয় থেকে মহম্মদ ঘুরীর দিল্লির তক্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে পাঁচশ বছরের ব্যবধান। সামরিক শক্তি(তে ভারতীয়দের অন্যান্য জাতির তুলনায় হীন বলে বঙ্কিম মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এই ধারণার পিছনে *''ভারত-কলঙ্ক''* প্রবন্ধে তিনি যেসব কারণ উল্লেখ করেন সেগুলির মধ্যে প্রথম হল হিন্দুদের ইতিবৃত্তের অভাব। দ্বিতীয়ত, হিন্দুরা বিধর্মীদের ঘৃণা করত। তাই তারা তাদের দেশ জয় করার কোন চেষ্টা করেনি। বরং দেশান্তরে জাতি - ধর্ম বিনাশের সম্ভাবনায় তারা ভীত ছিল। ভারতবর্ষের পরাধীনতার আরও কতকগুলি কারণ বঙ্কিম নির্ণয় করেন। এদেশের প্রকৃতি উর্বর। সহজে ফসল ফলে। অল্পায়নে জীবন-ধারণ সম্ভব। ভারতীয় স্বভাব যতটা ভাবপ্রবণ ততটা কর্মঠ নয়। সামাজিক সংহতির অভাব বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। ইংরিজি লিবার্টি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স শব্দদুটি বাংলায় তিনি স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দ্বারা অনুবাদ করেন।

''যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান - শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহাঁজাদা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দি শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না।'' (''ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা'', *বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় খন্ড।)

ভারতবর্ষের অতীত এবং বর্তমান অবস্থার তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম সমাজ-ব্যব্যস্থার ওপর বিশেষ গু(ত্ব আরোপ করেন। প্রাচীনকালে রাজকার্য সমাজে সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় রাজার মধ্যে বিভেদ করত না। বঙ্কিম বলেছেন, ''জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া, কখন হিন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কার্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত(হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্য(ার কারণ হিন্দুসমাজ কখনও তর্জ্জনীর বি(েপও করে নাই'' (''ভারত-কলঙ্ক'')। এই সাধারণ নিয়মের অবশ্য কতকগুলি ব্যতিত্র(ম আছে। মধ্যযুগে মেবার রাজ্যের দৃষ্টান্ত বঙ্কিম স্মরণ করেন। অনুরূপভাবে শিবাজী এবং রঞ্জিত সিংহ যথাত্র(মে মারাঠা এবং শিখদের মধ্যে জাতীয়ভাব সৃষ্টিতে সফল হয়েছিলেন। তাঁদের কীর্তি স্মরণ করে বঙ্কিমের আ(েপ— ''যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখন্ড জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?'' জাতিভেদ প্রথার অনিষ্ঠকর পরিণাম সম্পর্কে বঙ্কিম আমাদের সচেতন করেন। ইংরেজ শাসনে ইংরেজরা যেমন অনুগৃহীত, হিন্দু রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণরা তেমন সমাজে বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার তুলনা করে বঙ্কিম যে সিদ্ধান্তে পৌছান ঃ

''যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গু(তর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এ(ণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে— আমরা পরহস্তর(িত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগকে রাজ্যর(া ও রাজ্যপালনবিদ্যা শি(া হইতেছে না— জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে

উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শি(লাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীনে না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন একদিকে (তি, তেমন আর দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপে(া প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের প(প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।''

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *''বঙ্গদেশের কৃষক''*-এ কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক দুর্গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে দুটি প্রতীকী চরিত্র অঙ্কন করেছেন— রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখ। এতে তিনি কৃষকদের একটি শ্রেণী হিসাবেই দেখেছেন— হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে নয়। *সাম্য* প্রবন্ধে তিনি মানুষের সমানাধিকারের কথা বলেছেন। পাশ্চাত্যের সমাজবাদী ধারণার সঙ্গে এই গ্রন্থে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ মেলে। পরে অবশ্য তিনি রচনাটিকে প্রত্যাহার করেছিলেন।

একসময় বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছিল কোঁত্-এর পজিটিভিজম্ (ধ্রুবদর্শন বা প্রত্য(বাদ) এবং বেন্থাম ও মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ (হিতবাদ ও উপযোগবাদ)। *দেবী চৌধুরাণী*-র (১৮৮৪) মটো হিসাবে কোঁত্-র ''Catechism of Positive Religion'' থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে অনেক জায়গায় কোঁত্-এর তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। হিতবাদ এবং ধ্রুববাদের স্থান গ্রহণ করে হিন্দুর শাস্ত্রসংহিতা ও ভক্তি(দর্শন। সীলি (Sir John Robert Seeley, 1834-95) রচিত Ecce Homo (Behold the Man) গ্রন্থের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। এই গ্রন্থে যিশু খ্রিস্টের ঈ(রত্ব অস্বীকৃত হয়েছিল। Religion of Culture তত্ত্বের জনক সীলি। ''The substance of religion is culture''—তাঁর এই মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে মানবজীবনের তাৎপর্য বিচারে নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে গু(-শিষ্যের আলোচনায় তার প্রভাব দেখা যায়। কৃষ(চরিত্র রচনার সময়েও এ তত্ত্ব তাঁর মনে ছিল, যদিও ধর্মতত্ত্ব তার দু-বছর পরে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব মূল তত্ত্ব এবং কৃষ(চরিত্র তার ফলিত ব্যাখ্যা *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, ''আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত।'' কেন না ''অনুশীলন ধর্মে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ(চরিত্র কর্ম(ত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তাহার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ(চরিত্র সেই উদাহরণ। যথার্থই তাঁর প্রকৃত চরিতকথা কি ছিল, তা একালে বি(-ষণ করা দুঃসাধ্য।'' কৃষ(চরিত্রের বিচার - প্রসঙ্গে বঙ্কিম সম্পূর্ণ যুক্তি(ও বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কৃষ(চরিত্রের যে বর্ণনা তাঁর কাছ যুক্তি(বিরোধী মনে হয়েছে তাকে তিনি অম্লানবদনে পরিত্যাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ-

''বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অ(মতা, অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপে(বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ— একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্য দিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা— যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয় সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে সেই বল্গার আকর্ষণে তাহাকে সর্বদা সংযত করিতে হইবে।'' (বঙ্কিমচন্দ্র, *আধুনিক সাহিত্য*)

বঙ্কিম জাতীয়তাবাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম আমরা যাঁকে সাধারণতঃ যাকে ''পেট্রিয়টিসম'' বলি তা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। *ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে* ''স্বদেশপ্রীতি'' অধ্যায়ে তিনি বরং বলেছেন—''ইউরোপীয় Patriotism

একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করতে হইবে।.... জগদী(রের ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লেখেন।'' বঙ্কিমের শি(ানুযায়ী— ''আত্মর(া হইতে স্বজনর(া গু(তর ধর্ম, স্বজনর(া হইতে দেশর(া গু(তর ধর্ম। যখন ঈ(রে প্রীতি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈ(রে প্রীতি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপে(া গু(তর ধর্ম।'' প্রীতির স্বরূপ বোঝাতে বঙ্কিম বলেন— ''দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা নহে। তাহার ওপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম। যতদিন প্রীতির জগৎ পরিমিত স্ফূর্তি না হইল ততদিন প্রীতিও অসম্পুর্ণ- ধর্মও অসম্পূর্ণ।'' (ধর্মতত্ত্ব, একবিংশ অধ্যায়) বঙ্কিমের এই চিন্তা সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শক্তি(শালী একটি লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। পুরাবৃত্ত আলোচনা তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজকৃষ(মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬)। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ''বাংলার ইতিহাস প্রবন্ধে রাজকৃষে(র লেখা প্রথম - *শি(া বাঙ্গালার ইতিহাস* গ্রন্থের প্রশংসা করে বলেন ঃ 'ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। - ইংরেজিতেও যে সকল (ুদ্র ইতিহাস বালকশি(ার্থে প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না।'' তবে গ্রন্থটি কৃশ কলেবর (মাত্র ৯০ পৃষ্ঠা)। বঙ্কিম যে কারণে তাঁর আ(েপ গোপন করতে পারেন নি, ''মুষ্ঠিভি(া হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্ঠি''। রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) সেকালের অপর একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধদর্শন, ভারতের পুরাবৃত্ত সমালোচনা প্রভৃতির নাম করা যায়। পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্য ইটালির ফ্লোরেন্টিনো আকাডেমি তাঁকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১০.৪ স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ থেকে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের জয়যাত্রা শু(- একথা বলেছিলেন অরবিন্দ। পরবর্তী দশ বছরে বিবেকানন্দের বক্তৃ(তা ও লেখার সংখ্যা প্রচুর। ঘুমন্ত জাতির নিদ্রা ভঙ্গ করে তিনি নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আবেদন ছিল আন্তর্জাতিক। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ ''আমি যেমন ভারতের তেমনি সমগ্র জগতের।'' (*পত্রাবলী*, পত্রসংখ্যা ২১৩)। অন্যত্র পাশ্চাত্যবাসীর প্রতি ''শি(ালাভ করাই আমার ধর্ম। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাদের বাইবেলের আলোকে অধিকতর স্পষ্টরূপে পড়ি(তোমাদের ঈ(রের প্রেরিত মহাপু(ষের বাণীর সহিত তুলনা করিলে আমার ধর্মের অস্পষ্ট সত্যসকল অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য চিরকালই সার্বজনীন।'' (হিন্দুধর্ম, ধর্মসমী(া)

বিবেকানন্দ এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। সমাজের ওপরের স্তরের মানুষদের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য তিনি বলেছেন- ''আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর(আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি!!'' নতুন ভারত গড়ার কাজে বিবেকানন্দ তাকিয়েছিলেন শ্রমজীবী জনতার দিকে—''নূতন ভারত বে(ক। বে(ক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বে(ক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বে(ক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বে(ক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে— তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণু(তা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে— তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি(। এরা একমুঠো

ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে(আধখানা (টি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না(এরা রক্ত(বীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভূত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই''। (পরিব্রাজক) বিবেকানন্দ বিশেষভাবে আবেদন করেছিলেন যুব শক্তি(র কাছে— ''ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো— মানুষ চাই পশু নয়।'' (পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৬৭) শরীরচর্চার ওপর তিনি অত্যন্ত গু(ত্ব দেন। তিনি বুঝেছিলেন, দেহে মনে সুস্থ, সবল, নির্ভীক না হলে কোনো কাজই সম্পন্ন হবে না।

জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে স্বামীজি পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করেন। ''এই দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের খ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ তাহা কোনোকালে কোথাও দেখা যায় নাই।'' (পত্রসংখ্যা ৭৮) বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতা হিন্দুদের পতনের অপর এক প্রধান কারণ। সমুদ্রযাত্রার বি(দ্ধে বিধি নিষেধ স্বামীজী কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। (পত্রসংখ্যা ৬৭) খেতড়ির পন্ডিত শঙ্করলালকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি দেশের দুর্গতির জন্য আরও কতগুলি কারণকে দায়ী করেন ঃ- ''আমাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে পর্যবে(ণ ও সামান্যীকরণ (generalisation) প্রক্রি(য়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই। ইহার দুইটি কারণ ঃ প্রথমতঃ এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত আধিক্য আমাদের কর্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তা - প্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা বা দূরভ্রমণ করিবার লোক ছিল বটে, তবে তাহারা সবই ছিল বণিক(পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের আকাঙ্খা, তাঁহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে (দ্ধ করিয়াছিল।'' (পত্রসংখ্যা ৫৮) ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মসভায় যাবার পথে জাপানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখে তিনি বলেন ''জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে(তারা সম্পূর্ণভাবে জাগরিত হয়েছে — আর তারা তাদের নৌবলও ত্র(মাগত বৃদ্ধি করছে। এদের যে-কোন জিনিসের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা করছে।'' চীনদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চীনা শ্রমিকদের কাজ করার আগ্রহ তাঁকে সমান মুগ্ধ করেছিল। সেজন্য তাঁর উপদেশ — ''আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন জাপান যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার।'' (পত্রসংখ্যা ৬৭)।

বহির্বি(্ব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জ্ঞানের পরিচয় তাঁর রচনায়, বক্তৃ(তায় ও চিঠিপত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথমবার জাহাজে আমেরিকা যাত্রার পথে তিনি মালয় উপদ্বীপের পেনাঙ, সিঙ্গাপুর, চীনের হংকং ও ক্যান্টন এবং জাপানের কোবি, ইয়াকোহামা, কিয়োটো, ওসাকা প্রভৃতি শহর থেকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন তা জ্ঞানগর্ভ। স্বামী অখন্ডানন্দকে তিব্বত সম্বন্ধে লেখা এক চিঠিতে আমরা বুঝতে পারি সে দেশ সম্পর্কে তাঁর জানার কৌতূহল কত ছিল। তিব্বতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, তিব্বতীদের তন্ত্রাচার, কীভাবে তার অধঃপতন ঘটে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ত্র(মবিকাশ ও তার ভিন্নরূপ, বেদের কর্মবাদ, ইহুদী ধর্মের কর্মবাদ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের বি(দ্ধে বুদ্ধের প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে অতি সহজ চলিত ভাষায় ঐ চিঠিতে (পত্রসংখ্যা ৩৪) বিবেকানন্দের গভীর তত্ত্বমূলক আলোচনার কোনো তুলনা নেই। তিব্বত বিষয়ে স্বামীজীর সচেতনতার আরও পরিচয় পাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা এক চিঠিতে (মার্চ, ১৮৯৬) ঃ ''তুমি heart of Tibet তে দেখ নাই— only a fringe of the trade route. ঐ সকল স্থানে কেবল dregs of a nation— দেখতে পাওয়া যায়।' (পত্রসংখ্যা ২৬১) সিংহলের ইতিহাস সম্পর্কে স্বামীজির সচেতনতার প্রমাণ নিচের পংক্তি(গুলি ঃ- ''সিংহলীরা দ্রাবিড়জাতি নয় - খাঁটি আর্য। প্রায় ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাংলাদেশ থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে তারা তাদের পরিষ্কার ইতিহাস রেখেছে। এখানেই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্র, আর অনুরাধাপুর ছিল

সেকালের লন্ডন।'' (পত্রসংখ্যা ৩২৫)। *পরিব্রাজক* গ্রন্থে সিংহল ভ্রমণের বিবরণ প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

ভগবান বুদ্ধের বাণী এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিবেকানন্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, ''খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ ঈ(ের ছিলেন, অন্যেরা হলেন ধর্মাচার্য।'' (*স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* দশম খন্ড ২০৪) এই ধর্মাচার্যদের তালিকায় দুটি নাম— মহম্মদ এবং লুথার। মাদ্রাজে এক বক্তৃ(তায় (''ভারতীয় মহাপু(ষগণ'') বুদ্ধ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ ''পৃথিবী এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্মযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ(ই যেন নিজের শিষ্যরূপে নিজ মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আর্বিভূত হইলেন।'' (ঐ, পঞ্চম খন্ড, ১৫৬) স্বামী অখন্ডানন্দকে এক চিঠিতে ভগবান বুদ্ধ সম্পর্কে বিবেকানন্দ আরও বলেছেন— ''তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গু(ত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে(নাই তাঁহার intellect এবং heart যাহা জগতে আর হইল না।'' (পত্রসংখ্যা ৩৪)। বুদ্ধের পর যেসব ধর্মপ্রচারক এদেশে আর্বিভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ''শঙ্করের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক, রামানুজ ও চৈতন্যের ছিল বিশাল হৃদয়।'' আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ(''ভারতীয় সকল মহাপু(ষের পূর্ণ প্রকাশস্বরূপ।'' স্বামীজি তাঁর পায়ে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন— ''যদি আমার জীবনে একটিও যথার্থ তত্ত্ব কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা তাঁহার— তাঁহারই বাক্য।'' (দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত(''ভারতীয় মহাপু(ষ'' শীর্ষক প্রবন্ধ)।

পূর্ববর্তী প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদদের অবদান বিবেকানন্দ সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি নিজেই বলেছেন — ''ইওরোপের প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতগণ সমালোচনাশক্তি(অপে(া অধিক কল্পনাশক্তি(লইয়া সংস্কৃতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জানিতেন অল্প, সেই অল্প জ্ঞান হইতে আশা করিতেন অনেক, আর অনেক সময়ে তাঁহারা অল্পস্বল্প যাহা জানিতেন, তাহা লইয়াই বাড়াবাড়ি করিবার চেষ্টা করিতেন।'' পাশ্চাত্যপন্থীরা আবার প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কোনরূপ উৎকর্ষ স্বীকার করতেন না। বিবেকানন্দ তাঁর সমকালে ইউরোপে কয়েকজন সংস্কৃত বিশেষজ্ঞের সন্ধান পেয়েছিলেন যাঁরা প্রকৃতই বিদ্বান এবং ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জার্মান পাণ্ডিত ডয়সেন তাঁর বিচারে এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পূর্ববর্তী ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে ম্যাক্সমুলার তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। ম্যাক্সমুলারের ভারত-প্রীতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— ''যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম।'' (''ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার'', *বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* দশম খন্ড, ১৮০) স্বামীজি ইতিহাসের মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করতেন। খেতড়ির মহারাজকে এক চিঠিতে (পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৮০) তিনি লেখেন ঃ ''যে ব্যক্তি(সর্বদাই স্বজাতির অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, আজকাল সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করে। অনেকে বলেন, এইরূপ ত্র(মাগত অতীতের আলোচনাই হিন্দুজাতির নানারূপ দুঃখের কারণ। কিন্তু আমার বোধ হয়, বিপরীতটাই সত্য। যতদিন হিন্দুরা তাহাদের অতীত ভুলিয়াছিল ততদিন তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া অসাড় অবস্থায় পড়িয়াছিল। যতই তাহারা অতীতের আলোচনা করিতেছে, ততই চারিদিকে নূতন জীবনের ল(ণ দেখা যাইতেছে।'' স্বামী ত্রিগুনাতীতানন্দকে পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহিত করে বিবেকানন্দ বলেন ঃ ''খ্রিস্টিয়ান মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন করে ওঠ দিকি।'' ভারতীয় মুসলমানদের খোঁজ রাখতেও স্বামীজি কত আগ্রহী ছিলেন তা তাঁর পরবর্তী উক্তি(থেকেই বোঝা যায় ঃ ''তবে কোনও আরবী জানা মুসলমান ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভালো হয়। ফারসী ভাষায় অনেক Indian History আছে, যদি সেগুলো ত্র(মে ত্র(মে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item হবে।'' (পত্রসংখ্যা ২৫১) বিবেকানন্দের চিন্তায় ভেদবুদ্ধির স্থান ছিল না। রামকৃষ(দেব বলতেন— যত মত তত পথ। বিবেকানন্দ তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। চিকাগো

ধর্মসম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি সব রকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। আলমোড়া থেকে এক চিঠিতে (১০ জুন ১৮৯৮) তিনি লেখেন ঃ-

''বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম- ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পুর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই— যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই। অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, 'সকল ধর্ম একত্বরূপ সেই এক ধর্মের বিবিধ প্রকাশ মাত্র', সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপে(া উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।'

''আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির প(ে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই — বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ— একমাত্র আশা।'' (পত্রসংখ্যা ৪০৫)

মানব সভ্যতার ত্র(মবিকাশ বোঝাতে বিবেকানন্দ একটি (pattern) উদ্ভাবন করেছিলেন। *বর্তমান ভারত* গ্রন্থে এবং আরও কতগুলি রচনায় (উপদহরণত, ''ভারতের ঐতিহাসিক ত্র(মবিকাশ'' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং খেতড়ির মহারাজ ও মার্কিন অনুগামিনী মেরি হল-কে ১৮৯৫ সালের কোন এক সময়ে এবং ১লা নভেম্বর, ১৮৯৬ সালে যথাত্র(মে লেখা দুটি চিঠিতে) আমরা এই ধারণার সম্মুখীন হই। কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর আরও অনেক দেশে সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল। তারা কেবল ধর্মকর্ম নিয়ন্ত্রণ করত না, রাজকার্যে গু(ত্বপূর্ণ মন্ত্রণা যোগাত। বৈদিক যুগের শেষে ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞের বি(দ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন হিসাবে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। বুদ্ধদেব ছিলেন (ত্রিয়। শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাভারতের কৃষ(ও তা-ই। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, সমাজে (ত্রিয়দের প্রভাব বাড়ছে। *গীতা*-য় শ্রীকৃষ(সকলের সামনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান মেলে ধরলেও সামাজিক বৈষম্যের সমস্যার সমাধান হয়নি। বিবেকানন্দ বলেছেন— ''স্পার্টানরা যে প্রকার হেলটদের উপর ব্যবহার করিত অথবা মার্কিনদেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপে(াও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'' (পত্রসংখ্যা ১৩) মৌর্য সাম্রাজ্য বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সহায় হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব ভিনদেশী জনগোষ্ঠী ভারত আত্র(মণ করেছিল, তাদের সাংস্কৃতিক মান তত উন্নত ছিল না। ত্র(মে এরা বৌদ্ধধর্মের কোলে স্থান লাভ করে। তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের ফলে ত্র(মশ তাদের আচারানুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ ক'রে বিকৃতি ঘটায়। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি থেকে দেশকে মুক্ত(করার (ে ত্রে শঙ্করাচার্য গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তবে তাঁর সীমাবদ্ধতা বিবেকানন্দের চোখে ধরা পড়েছিল ঃ-

''কিন্তু জাতিভেদে অতিনিষ্ঠা, সহজ ভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার— এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে সে আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব - ভক্তি(র বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপলব্ধির (ে ত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছিলেন।'' (দ্রষ্টব্য ''ভারতের ঐতিহাসিক ত্র(মবিকাশ'' শীর্ষক প্রবন্ধ) মধ্যযুগের ভক্ত(সন্তেরা— যেমন চৈতন্য, কবীর, দাদু, নানক এবং রামানন্দ মানুষের সমান অধিকার প্রচার করেছিলেন। বর্তমানে আমরা বৈশ্যতন্ত্রের অধীন।

ইংরেজ শাসনে বহির্জগতের সঙ্গে নতুন করে ভারতের সম্পর্কে স্থাপিত হলেও শোষণের চরিত্র বিবেকানন্দের লেখায় সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে। উনিশ শতকের শেষ বছরে মেরী হেল-কে (৩০ অক্টোবর ১৮৯৯) এক চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ ''বর্তমান ব্রিটিশ ভারতের মাত্র একটিই ভালো দিক আছে, যদিও অজান্তে ঘটেছে— তা

ভারতকে আর একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে চাপিয়ে দিয়েছে জোর করে। সংি(-ষ্ট জনগণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা হ'ত — অনুকূল পরিবেশে জাপানের ে(ত্রে যা ঘটেছে — তা হলে ফলাফল ভারতের ে(ত্রে আরও কত বিস্ময়কর হ'তে পারত। কিন্তু রক্ত(শোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হ'তে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের প(এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুট ক'রে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার, কিছু স্বাধীনতা ছিল।

কয়েক-শ অর্ধ শি(িত, বিজাতীয় নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান ব্রিটিশ ভারত সাজনো তামাশা— আর কিছু নয়।'' (পত্রসংখ্যা ৪৬৬) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি উত্তেজনা গোপন করতে পারতেন না। বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব তা তিনি সঠিক বুঝেছিলেন। সিপাহীদের সাহস এবং সংগ্রামী মনোভাব তাঁর শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। (দ্রষ্টব্য, শংকরীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খণ্ড, ১৮২২)।

দারিদ্র্য এবং অশি(াকে ভারতের অবনতির প্রধান কারণ বলে চিহ্নি(ত করে বিবেকানন্দ ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন— ''এ(ণে কার্য ঃ 'আধুনিক সভ্যতা পাশ্চাত্যদেশের ও 'প্রাচীন সভ্যতা' ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের মধ্যে সেইদিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল যেদিন হইতে শি(া, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চ জাতি হইতে ত্র(মশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্য(দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রসারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি— রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজ সংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের ব্রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তি(রা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।'' (পত্র সংখ্যা ৩৩২) পুনরপি— ''ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল— জনসাধারণের দারিদ্র্য। পত্রসংখ্যা ৯৮)। *বর্তমান* ভারত গ্রন্থে বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী— ''সর্বদেশে শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে।'' স্বামীজির সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কয়েকজন বলেছেন— রাশিয়া এবং চীনে শ্রমজীবী বিপ-ব সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা অবর্থ্য প্রমাণ হয়। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *প্রাগুক্ত(*, ৪৫৭)

১০.৫ অনুশীলনী

১) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস বিস্তারটি ব্যাখ্যা ক(ন।

২। স্বামী বিবেকানন্দের নতুন ভারত জীবনের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা ক(ন।

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

অমলেশ ত্রিপাঠী — *ভারতের মুক্তি(সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব* (নির্মল দত্ত কর্তৃক লেখকের The Extremist Challenge গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

তপন রায়চৌধুরী — *ইউরোপ পুনর্দর্শন* (গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লেখকের Europe Revisited গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)